অগস্ত্যযাত্রা

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ
৫৭/সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কল্যাণীয়া

মল্লিকা গঙ্গোপাধ্যায়কে

বিখ্যাত গ্রন্থকাব শ্রীআনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনার দিনেই লাইব্রেরি উঠে গেল। বুকের রক্ত জল করে তিল তিল করে ওরা গড়ে তুলেছিল এই লাইব্রেরি। আনন্দগোপাল স্মৃতি পাঠাগার। মাত্র দু'শো পোস্টার সারা শহরে ওরা মেরেছিল। তাতেই সব ভেস্তে গেল। আগবাড়িয়ে পোস্টার না মারলে আজ আর দেখতে হত না। আঃ গোঃ স্মৃঃ পাঠাগার এতদিনে চাই কি ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির মত বড় হয়ে যেত।

অচিন্ত্যব তাই মত। অচিন্ত্যকুমার ঘোষ। ওরফে ক্যাপটেন স্মিথ। বিশিষ্ট গোয়েন্দা নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী ওরফে মিস্টার ব্লেকের সে সহকাবী। আরও তিনজন সেদিন সেখানে ছিল। বিখ্যাত ম্যাজিসিয়ান প্রোফেসর আসফাকুল ইসলাম ও তার সাকরেদ পবিত্র দুই—যে-কিনা দরকারের সময় আসল কথা হারিয়ে ফেলবেই। আর তো লাবে। এসব তো আমরা জানিই।

আসফাকুলকেও না চেনার কথা নয়। এ-শহরে তার ম্যাজিক দেখেনি কে? আর সেখানে ছিল হায়দার আলি। ব্লেড, কাচ, কালি বা মাটি—যে-কোন জিনিস খেয়ে ফেলতে পারে। দিব্যি হজম। খাবার পরদিন কোনরকম অসুবিধে হবে না।

সেখানে মানে—ভৈরবের তীরে। বড় মাঠ। সময় সন্ধ্যা। টাউন ক্লাব আর ইউনিয়ন স্পোর্টিং লিগ খেলে সবে বাড়ি ফিরেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে শাদা গোলপোস্ট হারিয়ে গেল। পিচরাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে সাইকেল রিক্সা যাচ্ছিল। ডানদিকে কোর্টের লালবাড়ি এখন অন্ধকার।

রেল স্টেশন থেকে লম্বা পিচরাস্তাটা এসে পড়েছে ডাকবাংলোর মোড়ে। সেখান থেকে ছুটে গিয়ে শেষ হয়েছে রূপসার খেয়াঘাটে। তার এক পাশে আদালত, বড় মাঠ, ভৈরব নদী। অন্যদিকে জেলা স্কুল। মাঠের ওপারে মডেল স্কুল। সেখানে হেডস্যার নির্মল পাল বি-এ। তার পাশেই হৃদয়বাবুর প্রাইমারি স্কুল—পুকুর—গোলপাতার ঘর। তিনি একাই থাকেন। ওই পুকুরে একাই চান করেন। সাদা লম্বা দাড়ি চিরুনি দিয়ে আঁচড়ান। সেই চিরুনিতে মাথার শাদা বাবড়িও আঁচড়ান। আর দেন বক্তৃতা। কোন সভা পেলেই হল। নেমন্তন্ন লাগে না।

জেলা স্কুলের ক্লাশ সেভেনের এই পাঁচজন এখন অন্ধকারের মধ্যে ডুবে বসেছিল। আসফাকুল বলল, বোধহয় অমাবস্যা। চাঁদ নেই কোন।

অচিন্ত্য সেসব কথায় গেল না। আজ কতদিন হল রে—

পবিত্র বলল, তা-তা ধর গি-গিয়ে সাদ্দিন তো বটেই—তা-তাই না?

হায়দার বলল, হ্যাঁ সাদ্দিন হবে। আনন্দ আমাদের ভুলে গেছে বোধহয়।

এই প্রথম নৃপেন কথা বলল। সন্ধ্যে থেকে একবারও মুখ খোলেনি সে। যা সম্বর্ধনা আমরা আনন্দকে দিলাম! ভুলবে না তো কি?

এককথায় সবার চোখের সামনে সেই সম্বর্ধনা সভার চেহারাটা খানিকক্ষণের জন্যে ভেসে উঠল। যেসব বইয়ের দোকান থেকে চুরি করা বই এনে পাঠাগার হয়েছিল—সেইসব দোকানদার সম্বর্ধনা সভার ভেতরে দৌড়াদৌড়ি করছে। চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স। কেতাবিস্তান। গুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানি। নৃপেন আর অচিন্ত্যকে ধরবে বলে। আর ছুটেছে গোষ্ঠবাবু। টাউনলাইব্রেরির লাইবেরিয়ান। তিনি তাঁর লাইব্রেরির বইচোর হায়দারকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন।

অচিন্ত্য দুঃখ করে বলল, কত কষ্ট করে একখানা দু'খানা করে বই এনে তবে আনন্দগোপাল স্মৃতি পাঠাগার হয়েছিল—

নৃপেন বলল, আমি আর তুই কত কষ্ট করে দোকান থেকে একখানা দু'খানা করে বই হাত সাফাই করে চুরি করে এনে এনে—

সেই আনন্দই একদিনের জন্য এসে কোন আনন্দ পেল না। যার নামে পাঠাগার সে-ই চলে গেল। পালিয়ে যেতে হল একরকম। লাস্ট ট্রেনে কলকাতায় ফিরে গেল।

তাছাড়া কি। কত কষ্ট করে চারখানা একসারসাইজ বুকে উপন্যাস লিখে এনেছিল। 'অমঙ্গলের মঙ্গল'। অত ভাল স্টুডেণ্ট। অথচ আমাদের কত ভালবাসে। কোন গর্ব নেই। আমরা লিখে পাঠাতেই বই লিখে ফেলেছিল।

পবিত্র এই সময় হঠাৎ 'নিঃ' 'নিঃ' করতে শুরু করল।

তখন অচিন্ত্য বলল' নিরহঙ্কারী!

পবিত্র 'হু' বলে থামল।

আজ পাঠাগার চালু থাকলে আনন্দের 'অমঙ্গলের মঙ্গল' উপন্যাসখানা তো আমরা ছাপতে দিতে পারতাম। নিজেদের লাইব্রেরী! নিজেদের বই!

আসফাকুল আফসোসের সুরে বলল, নিজেদের বন্ধুর নামে পাঠাগার! এরকম কোথাও আর আছে?

ক'মাস আগে আনন্দর মামা কলকাতায় বদলি হয়ে যান। আনন্দ মামার কাছে থেকে ওদের সঙ্গে জেলা স্কুলে পড়ত। ইংলিশ সেকেণ্ড পেপারে আলি স্যারের হাতে ফিফটি-টু পেয়েছিল। অর্থাৎ হায়ার সেকেণ্ডারিতে গিয়ে নির্ঘাৎ আরও কুড়ি নম্বর বেশি পাবে। আলিস্যার খাতা দেখেন খুব স্টিফ করে।

এখন এ-লাইব্রেরির কথা সারা শহর জানে। মাত্র দুশো পোস্টার। সেই পোস্টারই কাল হল সবার। এখনো বোধহয় কোর্টের দেওয়ালে, রেল স্টেশনে দু'একখানা পাওয়া যাবে। চুরি

করে, কিছু কিনে—এদিক ওদিক করে আঃ গোঃ স্মৃঃ পাঠাগারের প্রায় একশো বই হতেই ওরা চিঠি লিখে আনন্দকে নেমন্তন্ন করে এনেছিল। সম্বর্ধনা দেবে। সেইসঙ্গে লিখেছিল—উপন্যাসখানা লিখে আনিস। নামও ঠিক করে দিয়েছিল বোধহয় আস্ফাকুল। কিংবা হয়তো আনন্দই ঠিক করেছিল। 'অমঙ্গলের মঙ্গল!' লিখেও এনেছিল।

কিন্তু সব ভেস্তে দিল ওই পোস্টারটা। তাতেই তো জানাজানি হয়ে গেল। সারা শহরশুদ্ধ লোক অচিন্ত্যদের বাড়ির সামনে এসে হাজির। গাদা গাদা গার্জিয়ান সেদিন গিজ গিজ করছিল। পোস্টারে লেখা ছিল ঃ

বিরাট জনসভা দলে দলে যোগ দিন

বিখ্যাত গ্রন্থকার আনন্দগোপাল

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা

সভাপতি ঃ প্রোঃ আসফাকুল ইসলাম

ম্যাজিক দেখানোর সময় আসফাকুল প্রফেসর হয়ে যায়।

আনন্দগোপাল স্মৃতি পাঠাগার

প্রাঙ্গণে দলে দলে যোগ দিন

প্রধান অতিথি ঃ বিশিষ্ট গোয়েন্দা নৃপেন্দ্র-নাথ দত্তচৌধুরী

(ওরফে মিস্টার ব্লেক)

অচিন্ত্যদের বাড়িতেই ছিল আনন্দগোপাল স্মৃতি পাঠাগার প্রাঙ্গণ মানে ওদের বাড়িরই সামনের মাঠ।

হায়দার আপন মনে বলল,আসফাকুলের আব্বাজান কোত্থেকে ব্রুকলিন সাহেবকে নিয়ে হাজির হল। তারপরই তো গোলমাল শুরু হয়ে গেল।

অচিন্ত্য বলল, হবে না! ব্রুকলিনকে গিয়ে আসফাকুল বলেছে, আমার বাবা নেই। মা নেই। পুত্তর বয়। হেল্প মি! অ্যানুয়ালে আই স্টুড্ ফার্স্ট। তারপর—

আসফাকুল নিজেই বলল, তারপর সেই একশো টাকায় কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ, রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের বই কেনা! ভূতের মত অদ্ভুত! ছিন্নমস্তার মন্দির! তারপর আসফাকুলই বলল, স্টিমার কোম্পানির ব্রুকলিনের সঙ্গে যে আব্বার ভাবসাব হয়ে যাবে —এতো আর ভাবতে পারিনি আগে।

সবারই একে একে সব মনে পড়ছিল। নৃপেনের পেছনে বইয়ের দোকানদাররা ছুটছে। তাদের পেছনে ছুটছে নৃপেনের বাবা —জয়ন্তনাথ দত্ত চৌধুরী। তাঁর পেছনে ছুটছেন ওদেরই ক্লাস টিচার এস এম আলি সার। মাথায় সোলার টুপি। তার পেছনে হায়দার আলি। হায়দারের পেছনে টাউন লাইব্রেরির লাইবেরিয়ান গোষ্ঠবাবু। একেবারে মিউজিক্যাল চেয়ার! কেউ কাউকে ধরতে পারছে না। দৌড়াদৌড়িতে সভাপতির টেবিলের টেবিলক্লথ সুদ্ধ ফুলদানি মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি। তার ভেতর প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার হৃদয় বাবু দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে আরম্ভ করে দিলেন বক্তৃতা! ফ্রেণ্ডস্ অ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন—

এমন সময় একদম ট্রেন থেকে নেমেই রিক্সা সাইকেলে করে আনন্দ সোজা পাঠাগার প্রাঙ্গণে এসে হাজির। গ্রন্থকার শ্রীআনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। খাকির হাফপ্যাণ্ট। শাদা হাফশার্ট। বগলে পাণ্ডুলিপি। চারখানা একসারসাইজ বুক। চার নম্বরের চারখানা 'অমঙ্গলের মঙ্গল'

ওই পোস্টারই শনি। এখনো শহরের যেখানে সেখানে দেওয়াল কিংবা নারকেল গাছের গায়ে লাগানো পোস্টারগুলো ওদের দিকে তাকিয়ে যেন ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে। গা জ্বলে যায়।

রূপসা নদী বাঁক নিয়ে ভৈরবে এসে পড়েছে। সেখানে বাঁক নিয়ে ফ্লোরিকান স্টিমার ঠিক এইসময় স্টিমারঘাটায় এসে লাগে। স্টিমারের সার্চলাইটের আলো নদীর বুক থেকে সোজা পিচরাস্তা পার হয়ে বড়মাঠে এসে পড়ল। রাস্তায় দু'একটা রিক্সা সাইকেল সেই

আলোয় পড়ে খানিক চক চক করে উঠছিল। মাঠে বসেও ওরা তা দেখতে পাচ্ছিল।

এখন পিচ রাস্তায় কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে সার্চলাইটের জোরালো আলোয় ওদের দেখতে পেত। ওদের পাঁচজনকে। আসফাকুল, নৃপেন, হায়দার, অচিন্ত্য, পবিত্র। পাঁচজন ছড়িয়ে গোল হয়ে বসে আছে মাঠে। একদম ফাঁকা মাঠে। ফুটবল পেটানো ঘাস-উঠে-যাওয়া মাঠে।

লাইব্রেরির সাইনবোর্ডও নিয়ে গেল যজ্ঞেশ্বর ডাক্তার!

নেবে না! ওরই তো ডিসপেনসারির সাইনবোর্ড। ঠিক চিনতে পেরেছ!

কত কষ্ট করে দুপুরবেলা আমরা খুলে এনেছিলাম। পাড়ায় সবাই তখন ঘুমিয়ে। তারপর রাস্তার আলকাতরা মাখিয়ে 'বিনা অস্ত্রে চাঁদসির চিকিৎসা' মুছে ফেলে তবে নতুন করে লেখানো হল—আনন্দগোপাল স্মৃতি পাঠাগার।

তবু ঠিক চিনে ফেলল। সেই গোলমালের ভেতর চেঁচাচ্ছিল —এই তো আমার সাইনবোর্ড। এই তো—

আসফাকুল বলল, তখন তো ক্রুকলিন সাহেবের সামনে আব্বাজান আমায় ধরে পেটাচ্ছিল। নৃপেন বলল, আমার বাবা তখন চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্সের বড় চট্টোপাধ্যায়কে ধরতে গিয়ে তার শার্টের কলার হাতে উঠিয়ে এনেছে—আর চেঁচাচ্ছে—'আমার ছেলেকে তাড়া করা—দেখাচ্ছি'—আমি তাড়া খেয়ে দৌড়চ্ছিলাম আর শুনতে পাচ্ছিলাম—

সব গোলমাল হয়ে গেল।

আর কি কোনদিন আমরা লাইব্রেরি করতে পারব?

সবার শেষে কথা বলল পবিত্র। আনন্দ তো আর কোনদিন আসবে না। ডাকলেও না—

যেমন ওরা আপনা আপনি কথা বলতে শুরু করেছিল—তেমনি আবার সবাই থেমে গেল। স্টিমারের সার্চলাইটের আলো ঘুরে গেছে। এখন ফ্লোরিকান যতই ঘাটের দিকে ভিড়বে—ততই বড় বড় ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়বে। আর তাতে গয়নার নৌকো, ছোট ছোট টাবুরে নৌকো এদিক ওদিক দুলবে। ছোট ছোট লঞ্চও দুলবে। ঘাটে ঘাটে এখন ছোট বড় মাঝারি স্টীমার লঞ্চ মিলিয়ে পনর বিশখানা নোঙর করে আছে। সবচেয়ে বড় 'গারো' স্টিমার। তার ভোঁ বাজলে হাল টানতে টানতে মাঠের বলদরাও চমকে দাঁড়িয়ে যায়। ভাবে—এ আমাদের কোথাকার জাতভাই? এমন গম্ভীর তেজী, লম্বা গলা—

আরও অনেক আছে যেমন 'এস এস মাগুরা'। মাঝারি স্টিমার ঘাটে দাঁড়িয়ে সারেং-ঘর দেখা যায়। আবার আরেকটা বড় স্টিমারের নাম 'বালুচ,। ঘাটে ভিড়লেই তার ডেক থেকে সুন্দর মাংস রান্নার গন্ধ ভেসে আসে। ডেকের রেলিংয়ে কাক বসে থাকে সব সময়। তার সারেংকে বলে ক্যাপটেন। 'বালুচ' বড় নদী দিয়ে যায় নাকি। ছেড়ে যাবার সময় তার পাটাতন তোলা হয় লোহার শেকল গুটিয়ে। বহুদূর থেকে কড় কড় আওয়াজ পাওয়া যাবে তখন। শুনলে বুঝতে হবে—বালুচ ছাড়লো। তার সারেং শাদা ফুলপ্যাণ্ট পরে।

ওরা পাঁচজন এদানী লাইব্রেরি উঠে যাওয়ার পর থেকে বিকেল বিকেল স্টিমারঘাটায় যায়। সেখান থেকে কয়লার ঘেঁষ ছড়ানো একটা সরু পথ শহরের শেষে শিববাড়িতে গিয়ে শেষ। সেখানে শিবের জোড়া মন্দির। সামনে ভৈরব নদী। ওপরের বরফকল দেখা যায়। মন্দিরের মাথায় জোড়া ত্রিশূলের পাশে একজোড়া কচি অশ্বত্থ চারা গজিয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে তাই দেখে পরশু বিকেলে আসফাকুল বলেছে গুড্ সাইন। আমাদের ভাল সময় আসছে—

নৃপেন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে বলেছিল, কোথায় ভাল সময়! রোজ বাড়িতে বাবা পেটাচ্ছে। স্কুলেও তাই! ভগবান কি আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাবে না কোনদিন? এইভাবেই দিন যাবে?

আসফাকুলের মুখে রহস্য ফুটে উঠেছিল। আসছে! আসছে!! সুদিন আসছে দেখিস!!!

অচিন্ত্যর মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছিল, আর কবে? বাবা লাইব্রেরির আলমারিপত্র ভাঁড়ারঘরে নিয়ে গিয়ে মাকে ডালের কৌটো, ফিনাইলের টিন, মশলার বয়ম রাখতে বলেছে। আর বলেছে, খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশলে হাড় ভেঙে ফেলব।

নৃপেন বলল, সবার গার্জেনই ভাবে—তার ছেলেটি ভাল। আর অন্যরা সব খারাপ। তারাই তার ছেলেটিকে খারাপ করছে!

ঠিক বলেছিস। বাবাগুলো কবে ভাল হবে বলতে পারিস?

আসফাকুল এবারও বেশ রহস্য করে বলেছিল, হবে। হবে। সুদিন আসছে আমাদের!

এমন আরও অনেক কথা হয় ওদের। এখনওরা শহরের বাইরে নদীর ঘাটে নয়ত শিববাড়ির ওদিকটায়—কিংবা আরও দূরে খালিশপুরের কাছাকাছি মিলিটারির রুজভেল্ট জেটিতে ঘুরে বেড়ায়। শর্টে জায়গাটার নাম জেটিঘাটা। সেদিক থেকেই ইলিশ মাছের নৌকা এসে স্টিমারঘাটার জড়ো হয়। কাছাকাছিই ওদের ইলিশের চৌবাচ্চা—

সে এক মজার জিনিস।

কাল বিকেলভোর ওরা পাঁচজনে দেখেছে। এদিকে তীর। আর তিনদিকে নদীর গা ধরে অনেক বাঁশ গায়ে গায়ে পুঁতে চৌবাচ্চা বানানো। ইলিশের নৌকাগুলে এসে খোল খালি করে দিয়ে সব মাছ ওই চৌবাচ্চায় ফেলে। ভেতরেও নদীর জল। কিন্তু বাঁশের বেড়া ডিঙিয়ে মাছ বেরোতে পারে না। ওপর আস্ত আস্ত বাঁশ

দিয়ে বানানো শক্ত মাচার ঢাকনা। তার ওপর দিয়ে জেলেরা হাঁটছে। ভেতর থেকে মাছ তুলে তুলে ঝুড়ি ভর্তি করে বরফ চাপা দিচ্ছে। আর সন্ধ্যের ট্রেনে ওয়াগান বোঝাই দিয়ে কলকাতায় গাড়ি যাচ্ছে। • নদীর পারে কত যে দেখার জিনিস!

একটা লঞ্চের বাঁশি পাখির শিস যেন। অন্যটার আবার ভাঙা গলা। গারো ফ্লোরিকান, বালুচের ভোঁ গম্ভীর। এস এস মাগুরার বাঁশি বন্ধুর মত। পরশু বিকেলে আসফাকুলের শুনে মনে হয়েছিল —যেন তাকেই ডেকে বলছে—এই আসফাকুল। যাবি না আমার সঙ্গে? আয়। ভয় নেই। আমি ছোট নদী দিয়ে যাই—

দোতলার ডেকে দাঁড়ানো সারেংয়ের একগাল কালো দাড়ি। তাতে সব সময় একমুখ হাসি। কোন গোঁফ নেই বলে দেখা যাবে।

ফেরার পথে চিন্তাহরণ হোটেলের সামনে দিয়ে শহরে ঢুকতে হয়। চারতলা শাদা হোটেল বাড়ির টানা ঝোলানো বারান্দায় বোর্ডাররা সবসময় দাঁড়িয়ে নদী দেখে। নয়ত নিমের ডালে দাঁতন করে। বিকেল হলেও। এমন কি সন্ধ্যে হলেও। কখন যে লোকগুলো ঘুমোয়? কখন যে ঘুম থেকে ওঠে? আর একতলার একটা লম্বা ঘণ্টার পাশে হাতল লাগানো চেয়ারে বসে থাকে চিন্তাহরণ বসু। তার পেছনের দেওয়ালে তারই ছবি টানানো। রাস্তা থেকে সব দেখা যায়।

কাবুলিরা খেতে বসলে ঘন ঘন ঘণ্টা বাজায় চিন্তাহরণ। বাজারের ভেতর থেকেও শোনা যাবে। নতুন ভাত খেতে শিখেছে কাবুলিরা। দল বেঁধে খায়। আর লঞ্চে করে এ-গঞ্জ সে-গঞ্জে সুদ আদায়ে বেরোয়। ফেরে সেই রাত হলে। ওরা নাকি বারে বারে খায় না। তাই একবারে বেশি খায়। মীল চার্জের ভেতর ভাত যত ইচ্ছে বলে—ওরা দল বেঁধে একবার খেতে বসলে আর নাকি উঠতেই চায় না। তাই—

তাই চিন্তাহরণ ওরা খেতে বসলেই মাঝে মাঝে ঘণ্টা বাজায়।
একদম নাকি লঞ্চ ছাড়ার নকলে। ফার্স্ট ঘণ্টা। দুটো ঢং।
সেকেণ্ডের বেলায় তিনটে। লাস্ট—ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং। আগে আগে
কাবুলিরা ঠকে যেত। ভাত ফেলে লঞ্চঘাটায় ছুটতো। লঞ্চ বুঝি
ছেড়ে যায়।

কদিন আগে খেতে বসে কাকাদের গল্পটা বলছিল বাবা। তাই
শুনে এসে নৃপেন কাল বিকেলে ওদের নিয়ে চিন্তাহরণ হোটেলে
ঘণ্টাটা দেখতে গিয়েছিল। প্রোপ্রাইটার চিন্তাহরণের চেয়ারের পাশে
সিলিং থেকে মোটা তারে রেলের একখানা ছোটমত কাটা পাটি
ঝোলানো। চিন্তাহরণের টেবিলে মোটা জাব্দা খাতার ওপর কয়লা
ভাঙার সাধারণ একটা কালো হাতুড়ি। ব্যাস্।

এতক্ষণে চাঁদ উঠল। তাহলে নিশ্চয় অমাবস্যা নয়। ভূগোলটা
এত গোলমেলে লাগে পবিত্রর। চাঁদের নাকি আবার ষোলটা কলা
আছে। দিনে দিনে তা প্রকাশ পায়। ভূগোলের কথাবার্তাই
কেমন অস্পষ্ট। রোগা ফ্যাকাশে চাঁদ মাঠ আদৌ আলো করতে
পারেনি।

তার ভেতর পাঁচটা মাথা, দশটা হাত দশটা হাঁটু আবছামত
দেখা যায়।

নে চল উঠি এবার। ক্ষিধে পাচ্ছে।

সেই হাফটাইমে লাইনস্‌ম্যানের হাতের বালতি থেকে দু"কুঁচি,
বরফ খেয়েছি মাত্র—

হায়দার বলল, বাজারটা ঘুরে যাই চল। কমলাপটিতে যাব
আর আসব।

কিন্তু র‍্যাপার তো আনিনি।

ডাকবাংলোর মোড়ে মইদ্যার দোকান থেকে চেয়ে নিয়ে যাব।

মতিদা দোকান করেছে সাবান সোডার। সেখানে হেরিকেনের
চিমনি, ঘুড়ি লাটাই—সব পাওয়া যায়। এদানী ওরা সে-দোকানে

পুরানো কাগজ সের দরে বেচে দিয়েও পয়সা পেয়েছে। মইদ্যা বলে, যা যেখানে পাবি—নিয়ে আসবি। আমি লেহ্য দরে কিনে নেব। মইদ্যার বিয়েতে ওরা বর যাত্রী গিয়েছিল—এই তো সেদিন।

ওরা পাঁচজনে উঠল। সবাই আগে আসফাকুল। বড়সড় লম্বা। ওর হাফপ্যাণ্টের ঘের অচিন্ত্যর বুকের মাপের সমান। একদিন ওরা সুতো ফেলে মেপে দেখেছিল। আসফাকুলের নাকের নীচে গোঁফের রেখা পড়েছে। সামার ভ্যাকেশনের আগে একদিন টিফিনে স্যারের টেবিলের ওপর হাতপা ভাঁজ করে শুয়ে পড়ে দেখিয়েছিল—গরমে বড় বড় কুকুর যেমন জিভ ঝুলিয়ে দিয়ে হাঁফায়। একেবারে হুবহু। সব সময় কপালের ওপর চুল এসে পড়ে বলে কথা বলতে বলতেও হাত দিয়ে মাথায় সিঁথি ঠিক করবে।

তারই পেছনে নৃপেন। বুক খোলা শার্ট, বাঁহাঁটুর মাথায় একটা বড় পাঁচড়া। কোন সময় শুকোয় আবার কোন সময় পেকে ওঠে। নিত্যসঙ্গী। নীলামের দোকান থেকে সাতাশি পয়সা দিয়ে একটা বাতিল গ্যাস মুখোস কিনেছে। মুখে লাগিয়ে বলেছে সবাইকে—ছদ্মবেশ নিতে সুবিধে হয়। ওর নিজের সাতখানা ডিটেকটিভ বই আছে। রিডিং পড়ে শোনায়। তাতে গোয়েন্দার নাম মিস্টার ব্লেক। যার বুকে সোজাসুজি গুলি লাগালেও মরে না। তার সাকরেদের নাম ক্যাপটেন স্মিথ।

ওদের নিজেদের ভেতর সেই নামে অচিন্ত্য পরিচিত। অচিন্ত্যর বাবা সারা বছরের আলু সস্তায় কিনে খাটের নিচে বালি বিছিয়ে দিয়ে রাখে। সেই আলু বেছে নিয়ে মাঝে মাঝেই গুলিতিতে বসিয়ে সন্ধ্যের অন্ধকারে অচিন্ত্য আশে পাশের বাড়ির কাচের জানালায় তাগ্ করে ছোঁড়ে। লাগলে নিঃশব্দে হাসতে হাসতে বসে পড়বে। টারজেন দেখে দেখে পচে গেছে ওর কাছে। এখন টারজেনের ডাক ডাকতে পারে। এমনকি টারজেনের হনুমান যে-ভাষায় কথা বলে—তার মানেও ও বলে দিতে পারে।

হায়দার রূপসার খেয়াঘাটের কাছে টুটপাড়ায় থাকে। বন্ধু বলতে পারে না। বলে—বন্দু। মার খাবার সময় বিপদ বুঝলে মুখচোখ বাঁচাতে আগে পিঠ এগিয়ে দেয়। সেখানে যত মারে—তাতে নাকি হায়দার আলির লাগে না। দম বন্ধ করে থাকে সেই সময়টা। কষের দাঁতে ব্লেড চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেলতে পারে। শার্টের বদলে কলার দেওয়া গেঞ্জিই হায়দারের পছন্দ।

হায়দার, অচিন্ত্যর পাশাপাশি হাঁটছিল পবিত্র। সদা সর্বদা শাদা হাফপ্যাণ্ট শাদা হাফ শার্ট পরবে। তাই ময়লাও হয় তাড়াতাড়ি কাচাকাচির বালাই নেই। ছিঁড়ে গেলে তবে ছেড়ে দেয়। কালি ভরতে গিয়ে ফাউণ্টেন পেন খুলতে না পারলে সার্টেই চেপে ধরে ঘুরোতে গিয়ে প্রায়ই এখানে সেখানে কালির ছোপ মাখিয়ে ফেলে। জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পর্যন্ত পারে। তখন একটুও আটকাবে না। কিন্তু পড়া ধরলেই জিব জড়িয়ে যাবে! ওর বাবার সঙ্গে ফি-রবিবার পবিত্রকে ও ঘাড় শাদা করে চুল ছাঁটতে হয়।

বাজারের শেষে কমলাপট্টিতে ইলেকট্রিক পৌঁছায়নি। সেখানে গ্যাসলাইট। পাশের ভৈরব থেকে হাওয়া উঠে এসে আলো নিয়ে নাচানাচি করে বলে এদিকে সেদিকে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল। আবার শিখাটা সিধে হয়ে দাঁড়াতে পেলেই সব জায়গায় সমান আলো পড়ছিল।

খেজুর পাতায় দু'খানা খোলপে পর পর বিছিয়ে তার ওপর ব্যাপারীরা কমলা সাজিয়েছে। সব কমলা উঠছে বাজারে। পর পর সাজিয়ে একে বারে কমলার পাহাড়। তার ওদিকটায় ব্যাপারী। এদিকটায় র‍্যাপার জড়ানো হায়দার কমলা বাছছে। পাশে অচিন্ত্য, পবিত্র উবু হয়ে বসে। নৃপেন আর আসফাকুল আরেকদিকে বসে দরাদরি করে ব্যাপারীকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল। যেমন ঃ দর বড্ড বেশী বলছ ভাই। একটু ঠিকঠাক বল। তাহলে ডজন দুই নিতাম —আসফাকুল থামতেই নৃপেন বলে উঠল, এঃ। একদম কাঁচা।

সবুজ ভাবটাই কাটেনি। বাগান থেকে একদম কাঁচা ছিঁড়ে নিয়ে এলে। পাকবার সময় দেবেতো—

ব্যাপারী কিছু বলতে যাচ্ছিল। অমনি পবিত্র শুরু করল, রোগী খাবে। এখন গোটা ছয়েক বেছে বেছে দাওতো ভাই—দাম তোমার যা ইচ্ছে হয় তাই নিও। আমার চাই ভাল জিনিস—

ততক্ষণে হায়দার ব্যাপার বিছিয়ে ফেলে গোটা চারেক কমলা তার নিচ দিয়ে অচিন্ত্য মারফৎ সাপ্লাই করে ফেলেছে। অচিন্ত্য সুধন্য স্যাকরার দোকানের পেছনে অন্ধকারে একবার ঘুরে এল। সেখানে কোন্ ব্যাপ্যারীর ফাঁকা ডালায় রেখে এসেছে।

দরাদরি, দেখাদেখি, বাছাবাছির ফাঁকে এরকম বার তিনেক অচিন্ত্য ঘুরে এল। ব্যাপারীর তখনো কোন সন্দেহ হয়নি।

প্রথমে উঠে পড়ল অচিন্ত্য আর হায়দার। তার খানিক পরেই আলাদা আলাদা করে বাকি তিনজনও ভেগে পড়ল। এত কমলার ভেতর কটা গেল বোঝে কার সাধ্য। ব্যাপারীর মনে খটকা জাগবার আগেই আরও অন্য সব খদ্দের এসে উবু হয়ে বসে কমলা বাছতে শুরু করে দিল। সে তখন আর ফুরসৎই পেল না।

আগে থেকেই ঠিক করা ছিল—কোথায় এসে মিট করবে।

একটু বাদে দেখা গেল—ওরা পাঁচজন চিন্তা হরণ হোটেলের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। সবার হাফপ্যাণ্টের পকেটই বেশ উঁচু উঁচু।

খুব মিষ্টি তো। খেতে খেতে আসফাকুল বলল, কমলায় খুব সি ভিটামিন— জানিস।

মাথা পিছু দুটো করে কিন্তু।

পবিত্র বলল, বাকি দুটো ?

অচিন্ত্য বলল, মইদ্যার বউয়ের নাকি জ্বরই ছাড়ছে না। ব্যাপার দেবার সময় বলেছিল ফলটল পেলে আনিস—

দশটা কমলা ফুরোতে দশ মিনিটও নিল না। ওরা তখন যে-যার বাড়ি ফেরার পথে। নৃপেন বলছিল, বাড়ি ফিরব কি করে।

বাবা নির্ঘাৎ খড়ম হাতে বসে আছে বারান্দায়। এত দেরি। আজ ঠিক পিঠে ভাঙবে—

হায়দার কমলা শেষ করার পর আস্ত খোসা চিবিয়ে খেয়ে দেখাচ্ছিল। চিবোতে চিবোতেই বলল, ভয়ের কি আছে। পিঠ পেতে দিয়ে দম বন্ধ করে থাকবি। একটুও লাগবে না। দেখিস—

কাল তো আবার ভূগোলের উইকলি পরীক্ষা। আ-আ-আফরিকার ন-নদনদী।

পবিত্রকে থামিয়ে দিয়ে অচিন্ত্য বলল, কাল তো পরীক্ষা হচ্ছে না। নতুন ভূগোল স্যার জয়েন করবে। গোপীনাথ মণ্ডল। কলকাতা থেকে আসছে। প্রথমদিন কি আর পড়াবে। দেখিস ছুটি দিয়ে দেবে—

আসফাকুল বলল, কিংবা গল্পও বলতে পারে—

নৃপেন বলল, কিছু ঠিক নেই বাবা! ভূগোলের স্যাররা পিটপিটে হয়। ভূপতিবাবুকে দেখিস নি। ফেয়ারওয়েলের দিনও দ্রাঘিমাংশ লঘুমাংস পড়িয়ে গেল—

কি বলছিস! লঘুমাংস নয়—লঘিমাংস। ওই হল আমার কাছে যা লঘু—তাইত লঘি।

জেলা স্কুলের কথা যারা জানে না তাদের একটু বলে দেওয়া ভাল। বিরাট মাঠের ভিতর লম্বা একতলা লাল বাড়ি। মাঠের চারদিকে তারের বেড়া। তার পাশে আছে ছায়া দেবার জন্যে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বকুল গাছ। সবুজ পাতার ভেতর গরমকালে বকুল পেকে লাল হয়ে থাকে। টিচার্সরুম আলাদা একটা বাড়ি। সেখানে হেডমাস্টার দেবেশ্বর মুখার্জী গোটানো গোটানো অ্যাটলাসের র‍্যাকের ভেতর বিরাট একটা টেবিলে দু'টো বড় বড় গ্লোব আর জোড়া বেত সাজিয়ে বসে থাকেন। তার জানলা দিয়ে মেহের আর আলিজান বেয়ারার ঘর দেখা যাবে। সে দুটো ঘরও লাল রঙের। তাদের ঘরের সামনেই বিরাট হরিতকি গাছ। তাতে সব সময় পাখি। স্কুল মাঠের

ভেতর তিনজোড়া শাদা রঙের গোলপোস্ট। এক সঙ্গে তিনটে ম্যাচ চলতে পারে। বড় গোলপোস্টের পাশেই হেডস্যারের কোয়ার্টারের রান্নাঘর। সেখানে বুড়ো মংরু ঘটিতে করে কালো কলসি থেকে ছেলেদের খাবার জল ঢেলে দেয়।

লম্বা স্কুল বাড়ির মাঝামাঝি সবচেয়ে বড় ঘরে নতুন সব বেঞ্চ গ্যালারির মত সাজানো। সে-ঘরে সায়ান্স পড়ানো হয়। আবার সে-ঘরেই ডিবেটিং কম্পিটিসন হয়। সন্ধ্যের দিকে সায়ান্স টিচার সুধাকরবাবু মাঝে মাঝে সে-ঘর অন্ধকার করে ম্যাজিক লণ্ঠন দেখান।

এই লম্বা স্কুল বাড়ির পেছনেই 'বি' ক্লাস হয়। সেখানে ক্লাস নাইনের পর কেউ কেউ কাঠের কাজ শেখে। করাত আছে। হাতুড়ি আছে। তার সামনে মাঠের ভেতর তিনটে প্যারালাল বার। আর রিংয়ে ঝোলার জন্যে উঁচু লম্বা কাঠের ফ্রেমে দড়ি দিয়ে এক জোড়া রিং ঝোলানো থাকে সব সময়। রিংয়ের খেলা দেখাতে আসফাকুল ওস্তাদ। ওতে ঝুলে ঝুলেই নাকি আসফাকুল এতটা লম্বা হয়েছে।

পুবে স্কুল মাঠের বাইরে রূপসার তীরে দুটো লম্বা হলদে বাড়িতে হস্টেল। নদীর ওপারের দূর দূর গাঁ থেকে পড়তে এসে ছেলেরা থাকে। সেখানে দুই বাড়িতে দু'জন টিচার থাকেন। দক্ষিণে স্কুলের গা ঘেঁষে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ারের বড় বড় বাংলো। কত গাছ গাছালি সেখানে। তার পেছনেই ভৈরব।

পশ্চিমে মসজিদের মাঠ আর সিভিল সার্জনের বাংলো। সেখানে একটা বড় করমচা গাছ আছে। উত্তরে পুলিশ লাইন। সব সময় প্যারেড হচ্ছে। তার কোণে হাসপাতাল। কিছুটা ছাড়িয়ে গেলেই কোর্ট। ফরেস্ট অফিস। সে বাড়িটাও লাল। তার উঠোনে একটা রবার গাছ আছে। অচিন্ত্য চাকু দিয়ে গাছটার গায়ে জখম করে মাঝে মাঝেই সাদা কষ বের করে আনে। সে-কষ সবুজ চওড়া রবার পাতার ওপর ঢালতে না ঢালতেই বাতাসে শুকিয়ে শক্ত রবারের মত হয়ে যায়।

এসব ফেলে ভৈরব নদী ধারে একটু এগোলেই একদম নির্জনে জেলখানার ঘাট। রেলিং লাগানো। নদীর ভেতর অনেকটা চলে গেছে। সামনেই জেলখানা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘণ্টা বাজে। জেলখানার উত্তরদিকে উঁচু ঘরটার জানালা দরজা সব সময় বন্ধ থাকে। নৃপেন বলেছিল, ওটা নাকি ফাঁসির ঘর। শুধু ফাঁসির দিন ভোরে আসামীকে জেলখানার ঘাটে চান করিয়ে নিয়ে ওই ঘরে তোলা হয়। তখন সে যা খেতে চাইবে তাই দেওয়া হয়। শুধু তখনই ও-ঘরের জানলা দরজা সব খুলে দেওয়া হয়।

ওদের জেলা স্কুলের নিজের অনেক জিনিস আছে। যেমন: দরবার টেণ্ট। বাংলায় বলে সামিয়ানা। হেডস্যার ইংরাজিতে বলেন, সাইম্যানা। চারদিকে ঝালর লাগানো। বিরাট। বছরে দু'বার স্কুল মাঠে ফেলে ঝেড়েঝুড়ে শুকোনো হয়। তখন আলিজান আর মেহের বড় বড় ছুঁচে মোটা টোন সুতো পরিয়ে রিপু করে। স্পোর্টসের দিন আর প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় এই সামিয়ানা টানানো হয়। তার নীচে তখন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পাশে হেডস্যার বসেন। অচিন্ত্য, হায়দার, পবিত্র তখন ওঁদের পায়ের কাছে বসে।

আর আছে স্কুলের নিজের ব্যাণ্ড পার্টি। বড় ড্রাম। পালখ লাগানো ক্যাপ। ছোট কেটেল ড্রাম। তার কাঠি। আর তিনটে ব্যাগপাইপ। এই পার্টিতে ওরা পাঁচজনেই আছে। হায়দার বড় ড্রামটা বুকে লাগিয়ে কাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিস-ট্রেটের সামনে দিয়ে লিড করে হেঁটে যাবে। তখন পায়ে শাদা মোজা কালো জুতো। অচিন্ত্য, আসফাকুল, নৃপেনের দম বেশি বলে ব্যাগপাইপ বাজাতে ওরাই চান্স পায় বেশি। তিন চারটে নল দিয়ে সুর বেরোয়। প্রত্যেক নলের গা দিয়ে সুতোয় ঝোলানো ভেলভেটের ফুল। হায়দারের পেছনে বাজাতে বাজাতে ওরা তিনজনে তালে তালে পা ফেলে এগোয়। তার পেছনে থাকে পবিত্র। ঝাঁঝর

বাজায়। ঝম্ ঝম্ ঝম্। ঝমর্ ঝম। ঝম্ ঝম্ ঝম্। তবে জন-গণ-মন গাইবার লাইনে পবিত্র দাঁড়াবে সবার আগে। ওর নাকি কোথাও একটুও আটকায় না। গানটা এত ভাল। বিশেষ র-ফলা নেই। ঋ-ফলাও নেই। গানটা নিয়ে এই এক সুবিধে।

স্কুল বসে সাড়ে দশটায়। হায়দার এল টুট-পাড়া থেকে। নৃপেন বি দে রোড থেকে। আসফাকুল কাছাকাছিই থাকে। কয়লাঘাটা পাড়ায়। পবিত্র আর অচিন্ত্য আসে সেই দূর বেনে-খামার থেকে।

পাঁচজনেই হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির। সাড়ে দশটার আগে পৌঁছতেই হবে। নয়ত শাস্তি খেতে হবে। ঠিক দশটা পঁচিশ মিনিটে অ্যাসেমব্লি শুরু হয়। তখন প্রেয়ার থাকে। চোখ বুজে মিনিটখানেক যে-যার হাউসে দাঁড়িয়ে থাকল। রেড্ ব্লু. ইয়েলো গ্রিন। চার লাইনে ভাগ হয়ে সারাটা স্কুলের সবাইকে দাঁড়িয়ে প্রেয়ার করতে হল।

তারপর হেডস্যার দেবেশ্বর মুখার্জী দিনের বাণী বললেন। স্কুল মাঠের চারদিক দিয়ে এখন কালো কোট গায়ে দিয়ে উকিলরা রিক্সায় আদালতে যাচ্ছে। তখন হেডস্যার বললেন, সত্যবাদী হও। কাহারও দ্রব্য অপহরণ করিও না। ধরা পড়িলে দশ ঘা বেত—

এখানে নৃপেন চোখ টিপে হায়দারের দিকে তাকালো। হেডস্যার তখন বলছেন, তোমরা ভালো হইলে আমি ভালো। তোমরা খারাপ হইলে আমি খারাপ। ডিসপার্স—

লাইন ভেঙে সবাই ক্লাসে ছুটলো।

এখুনি সারাটা স্কুল গম গম করে উঠবে। নতুন চকখড়ি, ডাস্টার নামডাকার খাতা হাতে স্যারেরা যে-যার ক্লাসে যেতে শুরু করলেন। পাঁচ মিনিটও হয়নি—সবে আলিস্যার 'নমিনেটিভ অ্যাসলুট' আর 'জিরাণ্ডিয়াল ইনফিনিটের' পার্থক্য বোঝাচ্ছেন—ইংরেজী গ্রামারের ক্লাস—হায়দার হাতে একখানা চিরকুট পেল। এখুনি

বেরিয়ে পড়। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট একটা কুমির মেরে এনেছে। এখন না গেলে আর দেখা যাবে না।,

নৃপেনের হাতের লেখা। হায়দার পড়েই হাতে হাতে থার্ড বেঞ্চে পাস করে দিল। খানিকক্ষণের ভেতর সবাই খবর পেয়ে গেল।

পবিত্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার একটু বাথরুমে যাব—

পরে যাবি।

পড়ে যাচ্ছে স্যার—

যা।

পবিত্র বেরিয়ে যেতেই নৃপেন থুথু ফেলার ভঙ্গীতে মুখটা ছুঁচলো করে স্যারের সামনে দিয়ে বাইরে চলে গেল। গিয়েই বকুলতলায় পবিত্রকে পেল। একে একে সেখানে হায়দার এল। অচিন্ত্য এল। সবচেয়ে শেষে আসফাকুলও এল। এসেই বলল, তোদের ফিরতে দেরি দেখে স্যার আমায় বাইরে ডাকতে পাঠালেন তোদের। কুমির দেখে এখুনি ফিরতে হবে।

ওরা পাঁচজন ডি এম-এর বাংলোয় তারের বেড়া টপকে ভেতরে ঢুকলো। একদম ভৈরবের তীরে দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনের ঘাটে লঞ্চ নোঙর করে দাঁড়ানো। নৃপেন বলল, কাল রাতে খেতে বসে বাবাই খবরটা দিল।

দেরি করে ফিরে কাল সন্ধ্যেয় মার খাসনি ?

খুব। তবে দম বন্ধ করে পিঠ এগিয়ে দিয়ে-দিলাম। দাগ আছে। ব্যথা পাইনি—তারপর নৃপেন বলল, ডি এম লঞ্চ থেকে গুলি করে মেরে ধরাধরি করে লঞ্চে নিয়েই ফিরেছে—কাল বিকেলে।

ওরা বাংলোর কাছাকাছি গিয়ে দেখলো ছোটখাটো একটা ভিড়। উঁচু বারান্দায় মোড়ার ওপর ডি এম নীল রঙের হাফপ্যাণ্ট পরে বসে আছে। হাতে পাইপ। বারান্দার নিচে লম্বা সাত আট হাত মরা কুমিরটা পড়ে আছে। ডি এম-এর হাঁটুর কাছে বন্দুকটা তার কোলে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। ফটোগ্রাফার ছবি তুলছে।

ওরা পৌঁছতে ছবি-তোলা শেষ হয়ে গেল। তখন সেই ভিড় থেকে বাজারের মুকুন্দ কষাই বেরিয়ে এসেই বড় ভোজালি আর হাতুড়ি দিয়ে কুমিরের পেট চিরে গায়ের চামড়টা পাকা হাতে খুলে ফেলল।

তারপর মুকুন্দ কুমিরের বড় পেটটা খুলে ফেলল। খুলতেই সবাই অবাক্। ছোটখাটো সরু একটা চৌবাচ্চার মত পেট। তার ভেতর মানুষের একটা শাদা কঙ্কাল গুঁড়িসুড়ি মেরে পাশ ফিরে শুয়ে আছে।

মুকুন্দ যা বলল, তার মানে দাঁড়ায়ঃ কয়েকদিন আগে এই মানুষটিকে কুমির খেয়েছিল। পেটের ভেতরের ভাপে মাংস সেদ্ধ হয়ে গেছে। পড়ে আছে কঙ্কালটা।

ডি এম বের করতে বলল।

কুমিরের পেটের রক্ত মাখানো কঙ্কাল বাইরে বাঁধানো উঠোনে বের করে মুকুন্দ বালতি বালতি জল ঢেলে শাদা করে ফেলল। তখন দেখা গেল, কঙ্কালের গলায় হার। হাতে চুড়ি।

ডি এম বলল, মেয়েমানুষ ছিল।

মুকুন্দ বলল, সাহেব—কুমির বড় চালাক হয়। গাঁয়ের বউ হয়ত নাইতে নেমেছিল। তক্কে তক্কে থেকে কুমির পা কামড়ে জলে টেনে নিয়ে গিয়ে খেয়েছে। আহা!

বড় একখানা মেঘ নদীতে ছায়া ফেলল। বড় বড় নৌকোর পালে বাতাস। ওদের পাঁচজন এর আগে কোনদিন কুমির দেখেনি। আর এভাবে ওদের চোখের সামনে তার পেটের ভেতর থেকে মানুষও বেরোয় নি। অচিন্ত্যর মনে হয়, যাদের বাড়ির মেয়ে—তারা হয়ত হার চুড়ি দেখে চিনলেও চিনতে পারে। কিন্তু তারা কি এখন আর এসব গয়নার জন্যে দাবি করতে আসবে। তাদের মেয়ে তো আর ফিরে পাবে না। কুমিরদের শিকার করে মেরে ফেলাই সবচেয়ে ভাল।

ঢং করে ঘণ্টা শুনেই ওরা চমকে উঠল। ছুট্ ছুট্। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল। আজ হবে'খন। আলিস্যার নিশ্চয় মেরে তক্তা করে দেবেন।

স্যার তখনো যাননি। বোর্ডে উদাহরণ লিখছিলেন। একসঙ্গে পাঁচজনকে ঢুকতে দেখে কিছু বললেন না। পড়ানো হয়ে গেলে যাবার সময় শুধু বললেন, টিচার্স রুমে তোমরা দেখা করবে আমার সঙ্গে। টিফিনের সময়।

শুনেই তো পবিত্রর হয়ে গেল। আ-আজ যা মা-মা-মারবেন—

হায়দার বলল, ভয় কি! পিঠ এগিয়ে দিয়ে দম বন্ধ করে থাকবি। একটুও লাগবে না। আমরাও মার খেলাম। স্যাররাও মারলেন। কারও কিছু বলার থাকবে না। নিয়মটা ফাঁস করিসনে কিন্তু—

য-যদি সা-সামনের দিকে মা-মারতে চান। ধ-ধর যদি হা-হা-হাতেই মারেন—

তাহলে কপাল খারাপ।

নতুন একজন লোক ক্লাসে ঢুকেই চেয়ারে বসে বলল, সিট ডাউন বয়েজ। আমি তোমাদের জগ্রাফি টিচার।

এমন আচমকা ঢুকতে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। অচিন্ত্যরা এতদিন জিওগ্রাফি বলে এসেছে। সোজা কথায় ভূগোল স্যার। তা অমন জগ্রাফি হয় কি করে। ইনিই তাহলে মিস্টার জি এন মণ্ডল। গোপীনাথ মণ্ডল। শাদা ফুলপ্যাণ্ট—শাদা ফুলশার্ট। চোখে কালো চশমা। সিঁথি কেটে আঁচড়ানো কালো চুল।

স্যার রোল ডেকে আলাপ করছিলেন। দুটো একটা প্রশ্ন করছিলেন।

একবার বললেন, আনচাল্লিশ্—

সবাই তাকিয়ে আছে দেখে স্যার আবার বললেন, থার্টি [illegible]?

অচিন্ত্য উঠে দাঁড়াল।

আগে সাঁড়া দিলে না কেন ?

বুঝতে পারিনি স্যার—

বাংলা বোঝো না ?

আমরা উনচল্লিশ বলি স্যার।

সিট ডাউন।

অচিন্ত্য বসে পড়তেই স্যার বললেন, চাল্লিশ—

কালীমোহন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়েস স্যার।

ওর ভাবভঙ্গীতে সারা ক্লাস হেসে উঠল।

স্যার বললেন, সাইলেণ্ট। সাইলেণ্ট। জগ্রাফি তোমরা কত পেজ পর্যন্ত পড়েছো ?

চাল্লিশ স্যার।

কালীমোহনের এই উচ্চারণে সারা ক্লাস হো হো করে হেসে দিল।

জি এন মণ্ডল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, অরডার। অরডার—

কালীমোহনের হাফপ্যাণ্টের ঝুল হাঁটুর নিচে। কোমরে একটা সরু বেল্ট। বুকপকেট থেকে ভাঁজ করা চাকু আর পেন্সিলের মাথা উঁকি দিচ্ছিল। ন্যাড়া মাথা। নাকে একটা বড় আঁচিল। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউসনের দিন ও স্টেজে উঠে নানা রকমের কমিক দেখায়। কুকুর, ছাগল, গরুর ডাক ডাকতে পারে। আর সব স্যারের সই হুবহু নকল করতে পারে। এমনিতে ঠাণ্ডা হাসিখুশি।

রাগলে কেঁদে ফেলে।

আগের স্যার তোমাদের কতদূর পড়িয়েছেন ?

আফ্রিকার নদনদী স্যার। পাহাড়-পর্বত।

একটা পর্বতের নাম বলতো ?

কিলিম্যানজারো।

গুড্। সিট ডাউন। একচাল্লিশ—

টং করে উঠে দাঁড়াল আসফাকুল।

ভূগোলে তোমার কি সবচেয়ে ভাল লাগে ?

আসফাকুল অনেকক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মরুভূমি স্যার।

কেন ?

কোন গোলমাল নেই। নির্জন। কেউ বিরক্ত করে না।

গোপীনাথ স্যার চশমা মুছে বললেন, একটা মরুভূমির নাম বলতো ?

আসফাকুল আবার ছাদের দিকে তাকাচ্ছে দেখে স্যার বললেন, সাহারার নাম শুনেছো ?

শোনা শোনা মনে হচ্ছে—

এয়ার্কি কোরো না।

আসফাকুলের মুখ কালো হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অচিন্ত্যদেরও হল। এ কেমন পর-পরের মত শক্ত করে কথা বলেন স্যার। এরকম কথা ওদের শোনা অভ্যেস নেই। মারে না। অথচ কথাগুলো গায়ে কেটে বসে।

এইভাবে অনেক কথা বললেন স্যার। কাউকে শক্ত কথা। কাউকে বাঁকা কথা। তার ভেতরে খোঁচ আছে বেশ বোঝা যায়। একেই কুমীরের পেটে মানুষের কঙ্কাল দেখে ওদের মনটা ভারি হয়ে ছিল। তার ওপরে এমনধারার কথাবার্তা। যা কি না ওদের কাছে একেবারেই নতুন—অথচ কঠিন। ওরা সবাই একেবারে থতমত খেয়ে গেল।

গোপীনাথ স্যার বললেন, পরশু ভূগোল আছে। ওদিন তোমাদের উইকলি পরীক্ষা নেব। আফরিকার নদনদী পুরোটা থাকবে।

সে কি স্যার ? এক সঙ্গে বাইশ পৃষ্ঠা ?

হ্যাঁ। মুখস্ত করবে। তাহলেই পারবে।

বাইশ পৃষ্ঠা মুখস্ত হয় নাকি স্যার ?

মেলা খ্যাচ্ খ্যাচ্ কোরো না। অ্যান্নুয়ালে মুখস্ত করতে হয় না?

সবাই চুপ করে গেল। এ কেমন ভাবে কথা বলছেন স্যার। তুমি তুমি করে কথা বলছেন—অথচ কথাগুলো কী ভীষণ কঠিন—রুষ্ট আর দয়ামায়াহীন। সারা ক্লাশটাই বিগড়ে গেল। কালী-মোহন যে অত শান্তশিষ্ট—সেও ক্ষেপে গিয়ে পর পর দুটো বাঘের ডাক দিল। তাতেই প্রায় ক্লাশ ভেঙে যাওয়ার দশা।

ঘণ্টা পড়তেই স্যার ক্লাশ থেকে রাগে রাগে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় বলছিলেন, বাঁকা লোহা কি করে সিধে করতে হয়—আমার জানা আছে।

নৃপেন বলল, এরচেয়ে তো মার ভাল ছিল। মারেন না—অথচ কিরকম কথা বলেন। চল্লিশকে বলেন চাল্লিশ। উনচল্লিশকে আনাচাল্লিশ। এ কিরকম লোক!

অচিন্ত্য বলল, দাঁড়া না। উইকলি পরীক্ষাতে দেখাচ্ছি। এমন শিক্ষা দেব বাছাধনকে—সারা জীবন মনে থাকবে।

বলা দরকার জেলা স্কুলের এই ক্লাশ সেভেনে আরও একটা দল আছে। সে দলের লিডার বিশ্বনাথ ঘোষ। গায়ে খুব জোর। লম্বা চওড়া। কালো রঙ। সবে দাড়ি উঠছে। তার দলে আর যারা আছে—তাদের নামঃ কালীমোহন, দেবকুমার, মাখন, সনৎ। গোপীনাথ মণ্ডল ভূগোল পড়াতে এসে এই দু'দলকে এক করে দিল। নয়ত ওদের ভেতর রেষারেষি অনেকদিনের। বিশেষ করে ব্যাণ্ড পার্টির বাজানোতে বিশ্বনাথরা চান্স পায়নি বলে আসফাকুলদের ওপর ভীষণ রাগ। কিন্তু ভূগোল স্যার এসে ওদের মিলিয়ে দিল, কালীমোহন যে কালীমোহন—সেও বলল, গোপী স্যার ক্লাশে এলেই আমি বাঘ ডাকব। তোরা কিন্তু ধরিয়ে দিসনে—

কালীমোহনের তিন দাদাই দমকলে কাজ করে। এ-শহরে নতুন দমকল এসেছে। কিন্তু বড় একটা আগুন লাগে না বলে ওর

দাদাদের একরকম বসেই কাটাতে হয়। আজকাল 'রবিবার ওর দাদারা বড় বড় পুকুরে গিয়ে দমকল বসায়। তারপর হোসপাইপের জলের তোড় দিয়ে বেঁটে বেঁটে—এই একতলা দেড়তলা সমান নারকেল গাছ থেকে ঝুনো নারকেল পাড়ে। সে এক মজা। পবিত্র একদিন বর্ষাকালে ওদের বাড়িতে ইতিহাস পড়াটা জানতে গিয়ে দেখে কি—ওদের চাকর খোলা উঠোনে বর্ষায় বসে কলতলায় বাসন মাজছে—মাথায় তার দমকলের কার্নিশ টুপি। বামাচরণ একটু বেশি কথা বলে। নিজে থেকেই বলেছিল, দাদাবাবুর জিনিস। মাথায় জল লেগে ঠাণ্ডা বসবে—তাই পরে নিলাম।

দমকলের জিনিসে কালীমোহনদের বাড়ি ঠাসা। রবারের গামবুট। তাই পায়ে দিয়ে ওর বাবা বর্ষাকালে বাজার করেন।

থার্ড পিরিয়ডে বাংলা। ক্লাসটা খুব মজার। বাংলা পড়ান কুমুদবন্ধু ঘোষ। এতদিন সেণ্টজোসেফ স্কুলে পড়াতেন! কি জন্যে যেন সেখান থেকে চলে এসেছেন। টাক মাথা। মাথার চারদিকে গোল করে কাঁচাপাকা চুলের ছাউনি। ধুতি পাঞ্জাবি পাম্পসু পরেন। হাতে ছাতা। সবাইকে বাবা বলে ডাকেন।

কুমুদ স্যারকে সবাই চেনে শহরে। তার নিজের জন্যে নয়। তার বাবার জন্যে। এ শহরের বড় রাস্তা দিয়ে গেলে কুমুদ স্যারের বাবার কবিরাজির দোকানের সাইনবোর্ড চোখে পড়বেই। বিশেষ করে বড় বড় করে লেখা দুটি শব্দ—'হীরকভস্ম' আর 'মুক্তাভস্ম।' অচিন্ত্যরা ভেবেই পায় না—স্যারের বাবা অত হীরে মুক্তো কোত্থেকে পান? আর কোথায় বসেই বা হীরে মুক্তোভস্ম করেন? আর কারাই বা সে-সব জিনিস কেনে? কি জন্যে কেনে? হীরকভস্ম আর মুক্তাভস্ম খেলে কি হয়? স্যারের বাবা একটি এক নম্বরের রহস্য। লম্বা দালান বাড়ির সবটা জুড়ে নানা সাইজের হামানদিস্তায় তিন চারজন লোক বসে সব সময় ঘটাং ঘং কি পিষছে। আর বারান্দা জুড়ে নানারকম শেকড়বাকড়

শুকোতে দেওয়া থাকে। কোনটায় লটকানো শ্লিপে লেখা থাকে—'অনন্তমূল-১নং'। কোনটায় বা লেখা থাকে—'অর্জুন ছাল—সরেশ।' সেই বারান্দা দিয়ে স্যারের বাবা বাজপাখীর মত ঘোরাফেরা করেন। কানের সঙ্গে তার দিয়ে বাঁধা বড় চশমা। হাতে পাকানো তুলোট কাগজ থেকে কি দেখেন মাঝে মাঝে। নৌকোয় করে নদীর ওপারের দূর দূর গাঁয়ের রোগীরা আসে। তাদের পায়ের কাদা ঘসে ঘসে ধোবার জন্যে সব সময় বড় বড়-দু বালতি জল বারান্দায় রেডি করা থাকে।

কুমুদ স্যার ক্লাশে ঢুকেই বললেন, কিরে আস্ফাকুল—কাল তোরা চিন্তাহরণ হোটেলের ওখানে দাঁড়িয়ে কমলা খাচ্ছিলি?

আপনি ছিলেন কোথায় স্যার?

রিকশায় যাচ্ছিলাম। কত করে কিনলি?

টাকায় পাঁচটা করে স্যার।

টাকা পেলি কোথায়?

ডাক্তার খেতে বলেছে স্যার—

তাই বাড়ি থেকে টাকা দিয়ে দিয়েছে! বাজারে গিয়ে কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবার জন্যে।

স্যারের নজর বড শক্ত। কিছুই এড়ায় না। 'হ্যাঁ' বা 'না কি বলবে কিছুই ভেবে পেল না আস্ফাকুল।

টিফিনে ওরা পাঁচজন যখন টিচার্স রুমে গিয়ে হাজির হল—আলিস্যার তখনো অন্য ক্লাস থেকে ফেরেন নি। ওরা ভেবেই পাচ্ছিল না—স্যার কেন ডেকেছেন। আসছি বলে বেরিয়ে গিয়ে কুমীর দেখতে গিয়ে দেরি। স্যার মারলেন না। বকলেন না। অথচ পরে টিচার্স রুমে দেখা করতে বললেন। কি হতে পারে? কাল রাতের কমলা ব্যাপারীরা এসে কিছু বলে নি তো? কিন্তু তারাই বা চিনবে কি করে কোন স্কুলের ছেলে ওরা। শহরে তো আরও পাঁচটা স্কুল আছে। ওদের মত অন্তত আরও পাঁচ হাজার ছেলে আছে এই শহরে। চিনে চিনে বের করা কি অত সোজা।

আলিস্যার টিচার্স রুমে ফিরে এসেই ওদের ডেকে পাঠালেন। ঠিক বসবার ঘরে নয়। পাশের জলখাবার ঘরে। সেখানে তখন কেউ নেই। স্যার তাঁর টিফিনের কৌটো খুলে সবাইকে একটুখানি করে হালুয়া আর একখানা করে লুচি দিলেন। খেয়ে নে—

আপনি খান স্যার।

খাও না বলছি। তারপর স্যার টিফিন শেষ করে জল খেয়ে বললেন, তোরা আনন্দকে খুব ভালবাসিস না! ওর মত আরেকটা ছেলে পেলাম না—

স্যারের চোখ জানলা দিয়ে নদীর দিকে ফেরানো। সেই ভাবেই স্যার বললেন, মামা বদলি হল বলে আনন্দও কলকাতায় চলে গেল। তোরা করলি তার নামে স্মৃতি পাঠাগার। ভাল। কিন্তু আমায় বললি না কেন?

ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে আলিস্যার বললেন, যতটা পারি আমি বইপত্তর যোগাড় করে দিতাম। টাউন লাইব্রেরি, বইয়ের দোকান থেকে বই চুরি করতে গেলি কেন?

সাহস পেয়ে নৃপেন বলল, আমরা কোথায় বই পাব স্যার—

স্যার তখন অন্যদিক থেকে কথা শুরু করেছেন। তাঁর চোখ তখনো ঘরের জানলা দিয়ে ভৈরবের জলের দিকে তাকিয়ে। তোদের পোস্টার পড়ে দেখতে গিয়েছিলাম—কি করিস! পাছে আমায় চিনতে পারিস—তাই সোলার টুপি মাথায় দিয়ে চোখ ঢেকে বসে ছিলাম।

আস্ফাকুল বলল, স্যার গোড়ায় আপনাকে চিনতে পারিনি কিন্তু। যখন দৌড়োছিলেন—তখন চিনেছি।

আলি স্যার কোনোদিন এদের সঙ্গে এভাবে কথা বলেননি। আজ যেন একেবারে বন্ধু। স্যার ওদের ক্লাশ টিচার। ইংলিশ গ্রামার, ইংলিশ সেকেণ্ডপেপার আর ইতিহাস পড়ান। এই সেদিনও মোগলদের কথা পড়াবার সময় কি ভুল হওয়ায় নৃপেনের ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নিজেই বলেন—আই অ্যাম এ টাটার! তাতার দস্যু!! তোগে মারবার জন্যি আমার হাতের মধ্যি পোকা কিলবিল করে! কিলবিল করে!! একথা বলার সময় স্যার দু'হাতের পাঁচটা আঙুল তুলে কাঁপান। আজ যে কি হল স্যারের—ওরা তা বুঝেই উঠতে পারল না। সে স্যার আর নেই যেন। কোথায় মারবেন ধরবেন—বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে রাখবেন পুরো তিন পিরিয়ড—তা নয়! যত্ত সব—

তোরা খুব ভালো ছেলে। আমি এতদিন না বুঝে তোদের মেরেছি। ক্লাশ ফ্রেণ্ডকে যারা এত ভালবাসে তারা কখনো খারাপ হতে পারেনা—

অচিন্ত্য চোখ টিপে হায়দারকে ফিস ফিস করে বলল, বাড়িতে খোঁজ নিসতো একবার—স্যারের মাথাটা খারাপ হয়ে যায়নি তো—

আলি স্যার এখনো নদীর দিকে তাকিয়ে। আস্ফাকুল নৃপেনের পায়ে পা দিয়ে টিপলো, তার পর চাপা গলায় বলল, বলেছিলাম না? সুদিন আসছে। সুদিন!!

ওরা পাঁচজনই জানে, এখন স্যারের সাইকেলখানা মেহেরদের বারান্দায় হেলান দিয়ে রাখা আছে। তার রডে খোদাই করে লেখা—এঁস এম আলি বি এ (হনস্)।

তোরা অসুবিধেয় পড়লে সোজা আমার কাছে আসবি। আমি তোদের দিকে—

নিশ্চয় স্যার। একশোবার স্যার।

আর পড়াশুনোটা একটু মন দিয়ে কর। জানিস্ পড়াশুনো সবচেয়ে সোজা জিনিস। আমি দেখিয়ে দেব।

স্যার তখনো নদীর দিকে তাকিয়ে। ওরা চলে আসছিল। স্যারই আবার থামালেন, আজ ক্লাশ কেটে কোথায় গিয়েছিলি পাঁচজনে?

কুমির দেখতে স্যার। ডি এম কুমির শিকার করেছে তার পেটের ভেতর গয়নাগাটি সুদ্ধ মেয়েলোকের কঙ্কাল।

সব শুনে স্যার বললেন, বললি না কেন আমায়? সবাইকে নিয়ে গিয়ে দেখাতাম। এসব তো দেখার জিনিস—

বাইরে বেরিয়ে ওরা একরকম সিওর হয়ে গেল, স্যারের মাথাটি কোন কারণে খারাপ হয়ে গেছে। কোথায় সেই দাপট? কোথায় সেই তেজ? তা না শুধু নদীর দিকে তাকিয়ে থাকা। স্যারের বাড়ির সবাই ভালো আছে তো?

শুধু আস্ফাকুলই বলল, আমাদের ভালো সময় পড়েছে বুঝলি। জোড়া অশ্বত্থ চারা দেখেছি আমরা। তাও আবার জোড়া শিব-মন্দিরের মাথায়—দেখিস সুদিন আসবে আমাদের।

ইদানীং আস্ফাকুলের সব সময় একথা মনে হয়। বাড়িতে আব্বাজানের পিটুনি। স্কুলের সব পড়াশুনো কেমন গোলমেলে লাগে। এক শুধু প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউসানের সময় ম্যাজিক দেখাতে স্টেজে উঠলে তার কেমন খুশি খুশি ভাব আসে। তখনকার মত সে-ই যেন রাজা। আর বাকি সময় কোনদিকে যেন কোনরকম আশার আলো নেই। আছে। আছে। স্পোর্টসের সময় গাল ফুলিয়ে ব্যাগপাইপ বাজাতে বাজাতে হায়দারের পেছন পেছন তালে তালে পা ফেলতে বড় ভাল লাগে। তখন ওদের পেছনে পাহারা-দারের মত থাকে পবিত্র। হাতে ঝাঁঝর। ঝম্ ঝম্ ঝম্। ঝমর ঝম। সে কি আনন্দ। নয়ত অন্য সব সময় যেন শুধু দুঃখই তাদের জন্য ওৎ পেতে বসে থাকে। এর ভেতর থেকে মাঝে মাঝেই মনে হয়—সুদিন আসছে। অদৃশ্য এই বাতাস চিরে ফেলে হু হু করে ভালো সময় এগিয়ে আসবে। আসবেই। আস্ফাকুলের তো তাই মনে হয়। আমাদের কি সুন্দর সাধের পাঠাগার কেমন উঠে গেল। আর কোনদিন কি আমাদের কিছু হবে না?

টিফিন প্রায় শেষ হয়ে এল। এখনই আলিজান ঘণ্টা দেবে আর ক্লাসে ছুটতে হবে। একটু বাদেই স্কুল মাঠ ফাঁকা হয়ে যাবে। ক্লাসঘরগুলো গম গম করে উঠবে। মাঠের ভেতর ঠিকাদারের লোকজন রোলার টানছে। আর ক'দিন বাদেই স্পোর্টস্। রিলে রেস। গো অ্যাজ ইউ লাইক। যা ইচ্ছে সাজো। শুধু ধরা না পড়লেই হল। ভাজা ওয়ালা কিংবা পাগল। কিংবা জুতো পালিশ। একবার নৃপেন ভিখারী সেজেছিল।

সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠের ওপর দিয়ে গোল করে চুনের দাগ ফেলা হচ্ছে। তাতে এরপর চুন মাখানো সাদা মাটির খুরি বসিয়ে দেবে। এই গোল দাগ ঘিরে পাঁচ হাজার মিটার রেস। স্পোর্টস এসে যাচ্ছে। অথচ এখন সবাইকে ক্লাসে যেতে হবে। দু'একদিনের ভেতরেই হিট হবে। হিটে অ্যালাউ হলে তবে ফাইনালে দৌড়াতে দেবে। শুধু গো অ্যাজ ইউ লাইকের কোন হিট নেই। একবারেই ফাইনাল।

এখন কি কারও ক্লাসে যেতে ভাল লাগে ? নদীর পারে গেলে এখনই দেখা যাবে—ইলিশমাছের নৌকাগুলো জাল গুটোচ্ছে। গুটোনো জালের ভেতর জ্যান্ত ইলিশরা লাফাচ্ছে। তাতে রোদ পড়ে চিক চিক করে উঠবে। নদীতে এখন ঠাণ্ডা বাতাস। ঢেউগুলো ফেনা মাথায় করে তীরে ছুটে আসে। ফেনা রেখে দিয়ে আবার ফিরে যায়।

ফিফথ্ পিরিয়ডে অচিন্ত্য কপিং পেন্সিল চুষতে চুষতে জিভের রঙ একদম পাল্টে ফেলল। বিশ্বনাথ, মাখন, সনৎ ওরা থার্ড বেঞ্চে বসে কাটা কুটি খেলছিল। ড্রিল স্যার হাইজিন ক্লাস নিচ্ছেন ক'দিন তাঁর হাতে ধরা পড়ে বিশ্বনাথকে নিল ডাউন হতে হল। বেচারা এত লম্বা। হাঁটু মুড়ে একদম নিলডাউন হতে পারে না। তাই ফিরে ফিরেই হাঁটু ভাঁজ করছিল আর খুলে ফেলছিল। স্যার পা টাটায়—

স্যার বললেন, ওভাবেই থাকো। তারপর তিনি বুকের ভেতরের রক্ত চলাচল কি করে হয় বলতে লাগলেন। বোর্ডে ফুটবলের ব্লাডারের মত কি এঁকে বললেন—বাম অলিন্দ থেকে ডান অলিন্দে রক্ত যায়। এইভাবে ফুসফুসের বাতাসের চাপে রক্ত ক্রমাগত পরিষ্কার হয়—

সনৎ বলল, স্যার কচু খেলেও রক্ত পরিষ্কার হয়।

ড্রিল স্যার ধীরেনবাবু বললেন, স্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চ—

সনৎ বেঞ্চে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ স্যার—বাবা রোজ বাজার থেকে কচু আনেন।

আজও বিকেলে এস এস মাগুরা স্টিমারের সারেং সাহেব দোতলার ডেকে দাঁড়িয়ে সরবৎ খাচ্ছিল। বুক অব্দি লম্বা কালো দাড়ি। গোঁফের জায়গাটা কামানো। সরবতের গ্লাসটা পাশে দাঁড়ানো একজন খালাশির হাতে দিয়ে বাঁ হাত উলটে মুখ ঘসলো সারেং। তারপর ডান হাত দিয়ে ডাকলো ওদের।

নৃপেন বলল, এই! যাবি?

এই সারেংয়ের চেহারাটা ওদের চেনা। ওরা পাঁচজন তীর ধরে হাঁটবার সময় ফি-বিকেলে ওকে দেখে। শাদা প্যাণ্ট। শাদা কোট। কালো দাড়ি। খোলা বুকের ভেতর কালো লোমের জঙ্গলে সুতোয় বড় মত একটা লাল পাথর ঝোলে। বিকেলের রোদ পড়ে তা ঝিকমিক করে। হাতা গোটানো কোটের বাইরে দু,খানা মোট হাতে রেলিং ধরে সারেং সাহেব ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

জেটি থেকে কাঠের স্লিপার বেয়ে বেয়ে ওরা গিয়ে মাগুরা স্টিমারে উঠল। নিচের দিকে খোলে সিঁড়ি নেমে গেছে। ওপরের ডেকে সিঁড়ি উঠে গেছে সরু মত। দু'জন খালাসি নিচের দিকে একটা লোহার পাটাতনে দাঁড়িয়ে বেলচায় কয়লা ছুঁড়ে মারছে। উল্টো দিকে বয়লারের ভেতর দাউ দাউ আগুন জ্বলছিল। ওরা ঢাকনা আটকে দিতে২ গরম কমে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই সারেং-সাহেব লম্বা মোটা হাত এগিয়ে দিল আমি মহবুব সারেং। তোমাদের বিকেলে দেখি জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে। জাহাজ দেখবে?

মুখ ভর্তি হাসি। ওরা ওদের নাম বলল। নৃপেন আগে আগে। এই প্রথম ওরা হ্যাণ্ডশেক করল জীবনে। কি ভারি হাত মহবুবের। অচিন্ত্য বলল, আমার মেজো কাকার বয়সী হবে—

মহবুব সারেং তখন ওদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল। একতলায় বয়লার। কয়লা ঘর। পাশেই দু'জন মেট থাকে। কোণে দক্ষিণে রান্নাঘর থেকে মাংস রান্নার গন্ধ ভেসে আসছিল। মাগুরা স্টিমারের

মাথার দিকে লোহার বাঁকানো খুঁটি বসানো। সেই খুঁটি থেকে লোহার মোটা শেকল জলে গিয়ে পড়েছে। জলের নিচে বিরাট নোঙর মাটিতে গিয়ে গেঁথে আছে। মহবুব বলছিল।

পবিত্র একদম না তুতলে পরিষ্কার বলল, মহবুবদা তোমার ঘাড়ে ওটা কিসের দাগ—

হা হা করে ডেক কাঁপিয়ে হাসল মহবুব সারেং। তুফানের দাঁত। তারপর বুঝিয়ে বলল, বড় নদী দিয়ে যাবার সময় গত বছর একদিন সন্ধ্যে বেলা তুফান উঠেছিল। প্যাসেঞ্জাররা ভয় পেয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টির ছাট আটকাতে ত্রিপল নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মহবুব সারেং বলল, আমি তখন বয়লার ঘর থেকে বেরিয়ে সবে ডেকে এসেছি। দমকা হাওয়ায় ত্রিপল ছিঁড়ে গিয়ে আমাকে সুদ্ধ নদীতে নিয়ে গিয়ে ফেলছিল আর আর কি—

ওরা তাকিয়ে আছে দেখে মহবুব বলল, কি বড় বড় ঢেউ। পাটাতনের ওপর দিয়ে বড় বড় ঢেউগুলো মাথা ভেঙে ভেঙে পড়ছিল। আমি ম্যাপ ঘরের খুঁটি ধরে নিজেকে ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলাম। এসেই ছুটে স্টিয়ারিং ধরলাম—তখন—

একটা গোল চাকার সামনে গদি আঁটা চেয়ার। তাতে বসে পড়ে মহবুব সারেং চাকার হাতল ধরে বলল, এই হল গিয়ে মাগুরা জাহাজের প্রাণ। ছুটে গিয়ে ধরেছিলাম বলে সেদিন জাহাজ বেঁচে যায়। তখনই আমার ঘোর কাটে।

তারপর মহবুব দেখতে লাগল, কি করে স্টিমার নদীর ভেতর পথ চিনে চিনে নদী পালটায়—তীরে ভেড়ে।

তবু ওদের আশ্চর্য লাগছিল। জলের ওপর তো পথের কোন নিশানা নেই। জলে তো আর দাগ দিয়ে রাখা যায় না। তাহলে মহবুবদা কি করে বুঝবে—নদী কোথায় কতটা গভীর। কোথায় স্টীমারের খোল চুড়ায় আটকে যেতে পারে? কোথায় সাবধানে

বাঁক না নিলে মোড় ঘোরার সময় স্টিমারের লেজ ডুবো চরে আটকে যাবে ?

ওরা যখন তীরে ফিরে এল, ততক্ষণ নদীর পারে ভেড়ানো সব স্টীমারের আলো জ্বলে উঠেছে। তীরের দোকানে দোকানেও আলো। পাশেই রেল স্টেশনে সন্ধ্যের মালগাড়িতে কলকাতার জন্যে ইলিশ মাছ উঠছে। বড় বড় ঝাঁকায় মাছের ওপর বরফ চাপানো হচ্ছে।

আসফাকুলের বার বার আজই দেখা মরা কুমিরের পেটে মেয়েমানুষের গুঁড়িসুড়ি মেরে শুয়ে থাকা কঙ্কালের কথা মনে হচ্ছিল। কঙ্কালের হাতে চুড়ি। গলায় হার। নদীর নিচে কুমির তার পেটের নিচে মানুষ। মানুষের হাতের সোনা কুমিরের পেটের ভেতরে বিবর্ণ হয়ে যায়।

নৃপেনের মাথায় ঘুরছিল সারেং ঘর। গদি আঁটা চেয়ারটায় বসলে তিনদিকের নদী পরিষ্কার দেখা যায়। ডানদিকের দেওয়ালে বাঁধানো বিরাট ফটোর ভেতর ম্যাপ। সেই ম্যাপে নানান নদীর জন্যে লাল লাল লাইন আঁকা। বাঁ দিকে একটা উঁচু মত বাক্সের ওপর কম্পাস বসানো। তাতে একটা কাঁটা সবসময় উত্তর দিকে মুখ করে আছে। ওই চেয়ারে বসে মহবুবদা স্টীমারের সবাইকে চালায়। বয়লারে কয়লা আছে কিনা দেখে। ঠিক মত ধোঁয়া না হলে বয়লার ঠিক মত জোর নিয়ে চলবে না। প্যাসেঞ্জার খালাসি মোটঘাটসুদ্ধ স্টিমারকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় এই বয়লার।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা কুমুদ স্যারের বাড়ির কাছাকাছি চলে এল স্যারের কবিরাজ বাবা অন্যদিন এই সময় টানা বড় বারান্দায় বসে রোগী দেখেন। আজ বসেননি। ওরা স্যারের বাড়ির পেছন দিকটার রাস্তা দিয়ে শর্টকাট করে বি দে রোডে উঠতে যাচ্ছিল। স্যারের বাড়ির পেছনটা অন্ধকার মত। চার পাঁচ বাড়ির রান্নার ছাই ফেলে ফেলে সবাই মিলে জায়গাটা নোংরা করে ফেলেছে।

সাবধানে পা ফেলে এগোতে হচ্ছিল। পবিত্র প্রথমে থমকে দাঁড়াল ওটা কি রে?

সবাই থমকে দাঁড়াল। আবছা মত জায়গায় কি নড়ে বেড়াচ্ছে। সত্যিই তো। ওরা পাঁচজন একদম থমকে দাঁড়াল। আসফাকুল আস্তে বলল, চুপ স্যারের বাবা—

এখানে কি করছে? চুপ।

ওরা পাঁচজনে দেওয়ালের গা ধরে মিলে গেল। একটু পরেই দেখতে পেল, কুমুদ স্যারের কবিরাজ বাবা বড় একটা হাতা হাতে নিয়ে বকের মত অন্ধকার ছাইগাদায় জায়গা বদলে বদলে বসছে। পাশের বাড়ির একটা আলো জ্বলে উঠতেই জানালা দিয়ে তার একটা ঝলক ছাইগাদায় এসে পড়ল। সেখানে স্যারের বাবা তখন হাতায় করে ছাই তুলে হরলিকসের শিশিতে তুলছিলেন।

হায়দার হো হো করে হাসতে যাচ্ছিল। আসফাকুল তার মুখ চেপে ধরল।

নৃপেন ফিস ফিস করে অচিন্ত্যকে বলতে যাচ্ছিল, কোন গূঢ় রহস্য আছে। পাছে গলার আওয়াজে কবিরাজ বাবা চমকে যায়— তাই নিজের কথা নিজেই গিলে বসে থাকল।

শিশি ছাইয়ে বোঝাই হতে তিনি উঠে গেলেন। একদম বকের মত। লম্বা লম্বা স্টেপ ফেলে। চশমা নাকের ডগায় নেমে এসেছে। হাঁটু অব্দি ধুতি গোটানো।

নৃপেন বি দে রোডে উঠে বলল, লক্ষণ ভাল নয়।

অচিন্ত্য বলল, বিপদের গন্ধ পাচ্ছিস?

হুঁ।

পবিত্র আর থাকতে পারল না। কি-কি-কিসের বিপদ?

হলে বুঝবে'খন।

কি-কি হবে? স্যারের বাবা তো ছাই কুড়োচ্ছিলেন। ছাই দিয়ে অন্ধকার করে দেবেন?

যা বুঝিস নে—তাই নিয়ে ঠাট্টা করিসনে পবিত্র। আর এসব তোর বুদ্ধিতে কুলোবেও না—

নৃপেনের কথার সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন দিল অচিন্ত্য। চাই কি কোন বিদ্যুৎ স্টেশনে দু'দিনের ভেতর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। কিংবা ক্যালকাটা মেল ডি-রেল হয়ে গেল—

সব ওই ছাইয়ের জন্যে ?

ভেতরের ব্যাপার তুই বুঝবি কোত্থেকে ?

আমি তো বুঝেছি—স্যা-স্যা-স্যারের বাবা হীরকভস্ম, মু-মুক্তাভস্মের নামে উনুনের পোড়া ঘুটের মিহি ছাই চা-চা-চালাচ্ছেন। এ ছাড়া আর কি হতে পারে ? ত-তবে ঘুটের ছাই খে-খেয়ে কোন রুগী যদি ই-ইলেকট্রিক স্টেশনে বোমা মারে—তা তাহলে অন্য কথা !

হায়দারও বলল, সিম্পল ব্যাপার। এত ঘোলাটে করার তো কিছু নেই। হীরে মুক্তোর বদলে পোড়া ঘুটের ভেজাল। খুব ব্রেইনি বাবা মাইরি !

রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। বারান্দার বারান্দায় গার্জিয়ানরা তাদের ছেলে-মেয়েদের পড়াতে বসেছে। রাস্তার গায়ের বাড়িগুলো থেকে তারস্বরে ইতিহাস, ভূগোল, হাইজিন ভেসে আসছে।

নৃপেন দমল না। হালকা চালে হেসে বলল, বাইরে সব জিনিসই অমন সরল মনে হয়। বলতে পারিস ? ওই লোকটাই কুমুদ স্যারের আসল বাবা কিনা ?

নকল কেন হতে যাবে ! এক বছরের পুরানো বাবা।

হুঁ। ওই বুদ্ধি নিয়েই থাক ! হয়ত দেখ গিয়ে আসল বাবাকে কোন্ অন্ধকূপে আটকে রেখেছে। সারাদিনে মাত্র একখানা আটার রুটি খেতে দেয়। এক চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। কুমুদ, কুমুদ বলে কাঁদে—

তবে এই কবিরাজ বাবা আসলে কে ?

কোন নাগা কাপালিক হতে পারে। জার্মান ডিটেকটিভ হতে পারে—

বাংলা বলবে কি করে ?

হুঁ হুঁ। ওই তো মজা ! তুইতো আর লংসবেরির বইটা পড়িসনি। তাতে মিস্টার ব্লেক যখন—

হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছিল। হায়দার ধমকে উঠলো নৃপেনকে। থাম। নাগা কাপালিক কিংবা জারমান ডিটেকটিভ্ কোন দুঃখে কুমুদ স্যারের বাড়িতে এসে বাবা সেজে থাকবে ? ছাইগাদায় বসে ছাই কুড়োবে ?

অচিন্ত্য খুব করুণা করে হাসল। তুইতো আর 'লংসবেরির মঠ' বইটা পড়িসনি !

পড়িনি তো বেশ।

নৃপেন হায়দারকে দেখিয়ে অচিন্ত্যকে বলল, সাক্ষী এইভাবেই চটে ওঠে। তখনো জেরা চালিয়ে যাওয়ার নিয়ম—

হায়দার সে-কথায় কান না দিয়ে বলল, এই গরমের দেশে কষ্ট পেতে নাগা বা জারমান কুমুদ স্যারের বাড়িতে বাবা সেজে থাকবে কেন ?

আছে। আছে—কারণ আছে। ওর নামই তো রহস্য। সন্ধানীর আলোক পড়লেই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে।

হায়দার আর পবিত্র আরও কি বলতে যাচ্ছিল একসঙ্গে। পারল না। আসফাকুলেরও এতক্ষণ অস্বস্তি লাগছিল। ঘুরে ফিরে কখন বাড়ি যাওয়ার কথা। তা নয় আগডুম বাগডুম তর্ক। এখন দেরি করে ফিরে নির্ঘাৎ পিটুনি আছে কপালে। সন্ধ্যেটা মাগুরা স্টিমারে কি সুন্দর কাটলো।

হৈ হৈ করে একদল লোক ওদের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। ধর ধর ধর বলতে বলতে। সবার আগে কালো মত একজন লোক ছুটে

বেরিয়ে গেল। গায়ে কিছু নেই। পরনে হাফপ্যান্ট না কৌপিন—কিছু বোঝা গেল না।

ভিড়ের পেছনে কালীমোহনকে পেয়ে ওরা থামলো। কালীমোহন দৌড়তে দৌড়তে থামলো। চলে আয়। লেজওয়ালা মানুষ বেরিয়েছে—

আসফাকুল শক্ত করে ধরল কালীমোহনকে। কি বললি ?

ছাড় বলছি। দেখতে পাবো না—লোকটার লেজ আছে। সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ে ফিরে যাবার রাস্তা আর খুঁজে পাচ্ছে না। ছাড় বলছি—

ওরাও কালীমোহনের সঙ্গ নিল। পাঁই পাঁই ছুট। একদমে এসে বড় ভিড়টাকে ধরে ফেলল। তখন তার ভেতর থেকে একজন চেঁচাচ্ছিল। ঠিক মানুষের মতো দেখতে। এইতো এইমাত্র তাড়া খেয়ে ঢুকলো বাগানে।

চৌধুরীদের বিরাট আমবাগান। ভেতরটা অন্ধকার। ভিড় থেকে দু'জন ঢিল ছুঁড়লো সেদিকে। এখন কি আর বেরুবে ?

ভিড়ের ভেতর থেকে যে এ কথা বলল—সে আর কেউ নয়—জি এন মণ্ডল—নতুন ভূগোল স্যার—গোপীনাথ মণ্ডল। গায়ে সাদা ফতুয়া। নিচের দিকে ফুলপ্যান্ট। চোখের চশমা হাতে নিয়ে মুছছেন। দৌড়তে দৌড়তে থেমে গেছেন।

অন্যরা সবাই হই হই করছিল। একজন চেঁচিয়ে বলল, বেরিয়ে আয়, কিছু বলব না।

গোপীনাথ স্যার হো হো করে হেসে উঠলেন। খামোকা চেঁচাচ্ছো কেন ? ও কি আমাদের ভাষা বুঝবে !

তবে কি ইংরাজিতে ডাকবো ?

কোন লাভ নেই, মানুষের ভাষাই বুঝবে না। তারপর কি ভেবে ভূগোল-স্যার নিজেকে শুধরে নিলেন, আই মিন আমাদের

কোনো ভাষাই ও বুঝবে না। ইংলিশ জাপানীজ, রাশিয়ান—কোন ভাষাই নয়! ও অবশ্যি মানুষ। তবে অনেক আগেকার—

ফার্স্ট মুন্সেফের পেশকার—মাখনের বাবাও এই ভিড়ে ছুটতে ছুটতে এসেছেন। অচিন্ত্য দেখলো, ঘামে গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে মাখনের বাবা গোপীনাথ স্যারকে বলছে—কত আগের?

তা ধরুন ষাট হাজার বছর—

সারাটা ভিড়ের লোকজন একথা শুনে থমকে গেল। কি বলছেন নতুন ভূগোল-স্যার। পাগল হয়ে যাননি তো!

একজন বলল, এতদিন কেউ বাঁচে?

কখনো না।

তবে? অচিন্ত্য বুঝলো মাখনের বাবা মারমুখো হয়ে উঠেছে। এবার হয়তো গোপীস্যারের গায়ে হাতই চালাবে।

এই মানুষটা তখনকার মানুষের বংশধর। অবিশ্যি আমরাও তাই—

কি বললেন? আমাদের লেজ আছে?

কবে আমাদের খসে গেছে! ওরটাই খসেনি। চশমা মুছে স্যার চোখে লাগালেন। লাইটপোস্ট থেকে আলো এসে পড়েছে মুখে। কেন খসেনি সেটাই আশ্চর্য। এরকম মানুষ নাকি এখনো আন্দামান আর আফরিকার জঙ্গলে আছে। নর্থইস্ট আফ্রিকার জঙ্গলে ওরা থাকে। বাইরে আসে না। কাঁচা মাংস ফলমূল পাতা নাকি এখনো খায়। লোকালয়ের লোক দেখলে মেরে ফেলবেই।

এসব কথা শুনে কারও আর এখন অন্ধকার আমবাগানে ঢোকার সাহস হল না। কেউ বলল তিন চার দিন হল লেজ ওয়ালা এই মানুষটা জঙ্গল থেকে এসেছে। একজন বলল, সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে সমুদ্রের জোয়ারে লোকালয়ে ভেসে এসেছে হয়ত। তারপর

হাঁটতে হাঁটতে শহরে এসে পড়েছে। এখন আর ফিরে যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

অনেকে অনেক কথা বলছিল। পাশেই অন্ধকার আমবাগানটা দাঁড়ানো। কারো হাতে ঢিল। কারো হাতে লাঠি। মাখনের বাবার হাতে অফিসের লাইন টানার কালো রুল।

বুনো ডুমুরের গাছগুলো লতায় ঢেকে গিয়েছে। তাঁর ভেতর থেকে পাকা ডুমুরের গন্ধ উঠে আসছিল। পাখিরা নিশ্চিন্তে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। আসফাকুলরা যে কাছাকাছি আছে—সেদিকে কোন লক্ষ্যই নেই। এই হল গিয়ে খালিশপুরের জঙ্গল। শহর থেকে মোট তিন মাইল। পিছনেই শিববাড়ি। ভৈরব নদী। ওরা পাঁচজন সেকেণ্ড পিরিয়ডেই বেরিয়ে পড়েছে। স্পোর্টসের হিট হচ্ছে—তাই ক্লাস বিশেষ হচ্ছে না।

নৃপেন, অচিন্ত্য, পবিত্র, হায়দার, আসফাকুল—হাঁটতে হাঁটতে একদম খালিশপুরে। সঙ্গে গুলতি। যদি পাখি পাওয়া যায়। হাতে লাঠি। খরগোশ পড়লে পিটিয়েই কাবু করবে। সাপও পড়তে পারে।

বেলা বারোটা। চারদিক এরই ভেতর কি নিঃঝুম। গাছেদের মাথায় মাথায় আকাশ আর দেখা যায় না। সেই উঁচু থেকে পাখিদের গলা নেমে আসছিল। কখনো ভারি। কখনো গম্ভীর। তার ভেতর ঘুঘু কিংবা পায়রার কোন গলা নেই।

হায়দার হাতের লাঠি নিয়ে আশশ্যাওড়ার জঙ্গলে বাড়ি মারতে মারতে এগোচ্ছিল। সাপ নেই। খরগোশ নেই। বেঁটে বেঁটে আশশ্যাওড়ার কচিডাল লাঠির বাড়িতে ভেঙে যাচ্ছিল। সঙ্গে কিছু মিঠে ফল। এগুলো আশশ্যাওড়া গাছেই হয়। দাঁতে কাটতে খুব আরাম। চারিদিক শান্ত।

পরিষ্কার সতেজ সবুজ ঘাসের উপর এখানে ওখানে নানা জিনিসের মাথা পড়ে আছে। কঙ্কালের নিয়মই তাই। হাড়ের শরীরটা বড় তাড়াতাড়ি মাটিতে মিশে যায়। যেমন ধাড়ি সাপের

মাথা। শিঁয়ালের মাথা। গরুর চোয়াল। হায়দারের হাতের লাঠি সব কিছুর উপর বাড়ি দিয়ে দিয়ে ঘুরে আসছিল।

নৃপেনের মনে পড়ে গেল—বোধ হয় ব্লেকেরই কোন বইতে পড়েছে—ফস করে বলে দিল—যেকোন বড় বিপদের আগে কিন্তু চারদিক নির্জন থাকে। খুনের আগেই নেমে আসে নির্দোষ শান্তি।

নৃপেনের সহকারী অচিন্ত্য নিজেকে স্মিথ মনে করে। সেও নৃপেনের মতই মুখস্থ বলতে যাচ্ছিল—ঠাণ্ডা বাতাসে থাকে আগুনের বীজ—

পবিত্র তাদের থামলো। আর মুখস্থ বলতে হবে না। যেকোন জঙ্গলই এখন শান্ত হয়। বিপদ আপদ যদি কিছু থাকে সাপখোপ থেকে।

আসফাকুল বলল, গুলবাঘ বেরোতে পারে। ভাম বেরোতে পারে। আমাদের হাতে তো কোন অস্ত্রই নেই।

হায়দার বলল, খালিশপুরের জঙ্গলে আর ঘুঘু নেই। পায়রা নেই। খরগোশ নেই। এর চেয়ে আমবাগানে গেলে হত। অনেক সময় পাখি নামে।

সেখানে পাখি কি করে?

কেন?

তার ভেতরে তো ষাট হাজার বছর আগেকার সেই লেজওয়ালা মানুষটা—

নৃপেন বলল, ষাট হাজার বছর আগেকার মানুষের বংশধর। শহরে ঢুকে পড়ে আর ফেরার পথ পাচ্ছে না।

অচিন্ত্য বলল, গোপীস্যার প্রথম দেখেছে ওকে। দেখেই চিনেছে। জানালার শিক ধরে ব ব করছিল। স্যার সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশানাল জগ্রাফিকস্ ম্যাগাজিন খুলে ছবি দেখে মিলিয়ে নিলেন। তার পরেই চেঁচিয়ে উঠলেন, মাই গড্—

সবাই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। আসফাকুল বলল, স্যার দেখেই চিনেছে।

হাসেনি শুধু নৃপেন। সে বলল, কুমুদ স্যারের কবিরাজ বাবার সঙ্গে লেজওয়ালা লোকটার কোন যোগ নেইতো? বলা যায় না কিন্তু—

পবিত্র ভেঙিয়ে উঠল। তোর সঙ্গে কোন যোগ নেই তো!

সব ব্যাপারে ঠাট্টা করিস্‌নে। রহস্যের তুই কি বুঝিস?

নৃপেনের কথা তখনো শেষ হয়নি। ওরা বুড়ো সিঁদুরে একটা আমগাছের ছায়া ভেঙে এগোচ্ছিল। এই গাছটা ওদের চেনা। পাকা টুকটুকে আম হবে—খোসা ছাড়ালেই পোকা বেরিয়ে আসবে। গাছটারই যেন কী দোষ আছে। ডালে ডালে নানান লতা বেয়ে উঠেছে। গাছটার একেবারে বুড়োধুড়ো অবস্থা। ডালে ডালে আবার ভীষণ দয়ার গুঁড়ো হয়েছে। গায়ে লাগলেই সারাদিন চুলকোবে। তারই একটা ডাল থেকে ঝুপ করে কী খসে পড়ল। একদম ওদের চোখের সামনে।

পাঁচজনই ভড়কে গিয়েছিল। মানুষের মত। একটা মানুষই বটে। লম্বা লেজ। আরে এই তো। হায়দার লাঠি বাগিয়ে এগিয়ে গেল—

মারবেন না দাদাবাবু। আমি—

পবিত্র হায়দারকে থামালো। বাংলা বলছে রে—দাঁড়া হায়দার—

আমি বাঙালী স্যার। দি গ্রেট সাউদার্ন বেঙ্গল সারকাসের জোকার ছিলাম দাদাবাবুরা। ওই যাকে ক্লাউন বলেন আপনারা। খিদের চোটে আপনাদের স্কুল হস্‌টেলে গিয়ে কী বিপদ দেখুন আমার। এখন গাছে গাছে ঘুরছি। খবর পেলে সারা শহর ভেঙে পড়ে পিটিয়েই মেরে ফেলবে।

লোকটা থরথর করে কাঁপছিল। মাথার ওপরে বড় গাছের

ডালে পাখিদের ডাক থামেনি। কাঁদছিল লোকটা। সার্কাস আজকাল আর কেউ দেখে না দাদাবাবুরা। চাঁদপাড়া বাজারে তাঁবু ফেলা হল। বৃষ্টি বৃষ্টি। লোক হয় না। বাঘটার নিউমোনিয়া আর সারল না। ঘোড়া দু'টো রামছাগলের সঙ্গে ব্যাপারীরা কিনে নিয়ে গেল। শেষে তাঁবু খুঁটি, ভাঙা সাইকেল, শতরঞ্চি—সব কিনে নিলে চাঁদপাড়া বাজারের গোরাচাঁদ ডেকরেটর। তারপর থেকেই আমি বহুরূপী। আপনারা বিশ্বাস করুন দাদাবাবুরা। লেজ লাগিয়ে স্কুল হসটেলে মশকরা করতে গিয়ে এই বিপদ! চশমা চোখে মাস্টারসাহেব যে কি বললেন—তারপর থেকেই আগানে বাগানে দৌড়াচ্ছি। আমি খগেন সরকার জোকার। ক্লাউন বলতে পারেন।

হায়দার বলল, পিঁপড়ে বোঝাই এই বুড়ো আমগাছে উঠলে কি করে?

তারের খেলা দেখাতাম আগে। তার আগে ট্রাপিজের। ওরকম ওঠা আমাদের হামেশা অভ্যেস আছে।

আসফাকুল বলল, এত বিপদেও লেজটা ফেলোনি কেন?

নগদ পাঁচসিকেয় দু'তড়পা খড় কিনে তবে এই লেজ বানানো। রেলস্টেশনে চায়ের দোকানের সামনে নেচে গেয়ে যা পয়সা পেয়েছিলাম—তা দিয়ে খেয়াঘাটের খড়ের নৌকো থেকে দু'তড়পা কিনলাম। ফেলতে পারি দাদাবাবু? আবার তো লাগতে পারে।

ধরা পড়লে তো অক্কারাম হয়ে যেত।

রাতের বেলা শহরের ভেতর দৌড়াদৌড়ি করে—এ-গাছ থেকে ও-গাছে ঝুল খেয়ে উঠে গেলাম আম বাগানে। তারপর বেশি রাতে এই খালিশপুরের জঙ্গলে। এখন খিদেয় প্রাণ যায়—দু'টি খেতে দিন।

নৃপেন বলল, তোমাকে আমরা খাওয়াব। কিন্তু আমাদের না বলে কোথাও যেতে পারবে না।

তা বলে এই জঙ্গলে থেকে যাব—

সব সময় এখানে থাকতে হবে না। যখন যেখানে দরকার তখন সেখানে থাকবে।

পবিত্র অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে নৃপেন বলল, চাই কি পরীক্ষা হলে ধাতুরূপ সাপ্লাই দিলে। তুমি তো ভালো লাফাতে পার—

সার্কাসে থাকতেই শিখেছি দাদাবাবু—এখন দু'টো খেতে দেন—

আসফাকুল বলল, তোরা দাঁড়া, আসছি। ওর সঙ্গে একখানা এক টাকার নোট ছিল। আব্বাজান মাঝে মাঝে এক টাকার নোট গুণতে দিলে সরিয়ে ফেলে। হাত সাফাই আসফাকুলের জানা। খানিকটা গিয়ে ফিরে এল আসফাকুল। তুমি লেজটা খুলে রেখে নদীর ঘাটে যাও। পনেরো পয়সায় দাড়ি কামাবে। বাকি পয়সায় চিত্তাহরণ হোটেলে ডাল ভাত একটা তরকারি হয়ে যাবে।

মন্দ বলেন নি দাদাবাবু। লেজটাও থাকল—খিদেও মিটল। কিন্তু আমার কাজ কি হবে?

সে তুমি আস্তে আস্তে জানতে পারবে ভাই। আজ থেকে তুমি আমাদের হনুমানদা!

হনুমানদা?

পবিত্র বুঝিয়ে বলল, কী সুন্দর গাছে গাছে লাফাতে পার। আবার বাংলাও জানো।

আমি খগেন সরকার—জোকার—দাদাবাবু। বাংলা জানব না?

ওই হল। কিন্তু তোমার তো একটা ঘর দরকার। ছোটমোট্ট তাঁবু দিয়েও যদি ঘর বানাতে পার—

তাঁবু লাগবে না। একখানা দা দিন। আমি ডালপালা, বাঁশ কেটে নেব। খড় এনে দিলে ঘর হয়ে যাবে।

সেই ভাল।

আমার কাজ কি হবে ?

আস্তে আস্তে জানতে পারবে—

মাইনে ?

কাজ বুঝে।

আস্ফাকুল মনে মনে অঙ্ক কষছিল। কোত্থেকে টাকা পয়সা হাতানো যায়। তিরিশ টাকা মাসমাইনে হলেও তিরিশটা টাকা তো জোগাড় করা চাই।

পবিত্র অবাক হয়ে নৃপেনকে বলল, আমাদের এত কাজ কোথায় রে ?

আছে আছে। দেখিস তখন।

আস্ফাকুল বলল, হনুমানদা, তোমার নিজের খাবার দাবার নিজেও কিছু কিছু জোগাড় করবে। যেমন এই জঙ্গলেই পাখি পেতে পারো। খরগোশ আছে। মানকচু। বুনো আলু পাবে মাটির নিচে। কোদাল আর দা দিয়ে যাব তোমায়।

চাল কোথায় পাব দাদাবাবু ?

সে ভাবতে হবে না। অচিন্ত্য মনে মনে নিজেদের ধানের গোলাটার কথা ভেবে নিচ্ছিল। মা চাল তৈরি করিয়ে ভাঁড়ার ঘরে বড় টিনের ড্রামে রেখে দেয়। সেখান থেকে চাল সরিয়ে আনা কঠিন হবে না। শেষে বলল, তুমি রাঁধতে জানো তো হনুমানদা ?

খুব জানি। দি গ্রেট সাউদার্ণ বেঙ্গল সার্কাসে আমি জোকার ছিলাম। শো শেষ হলে কুক হয়ে যেতাম। চাঁদপাড়া বাজার থেকে অসুস্থ বাঘের জন্যে মোষের মাংস কিনেছি। আবার মালিকের জন্যে খাসির মাংসও আমিই কিনতাম। বৃষ্টিতে সার্কাস চলল না তো আর। শেষ দিকে বাজারের ব্যাপারীরা কোমরে নোটের গোছা নিয়ে বসে থাকত। আমরা যা বেচবো তাই কিনে নেবে—

সার্কাস চলল না ?

নাগাড়ে একুশ দিন বৃষ্টি। ফুটো তাঁবু। গ্যালারি ভাঙা।

বাঘের নিউমোনিয়া। রামছাগলগুলোর হাঁপানি। ঘোড়ার বাত। লাফাতে চায় না। নাচের মেয়ে দু'টোই প্রথম ভেগে গেল গোরাচাঁদ ডেকরেটরের সঙ্গে। একা আমি জোকার কতদিক সামলাব। তাই বহুরূপী হয়ে গেলাম! খালি পেটে তো আমি এই বনবাদাড়ে থাকতে পারব না।

তা থাকবে কেন?

কিন্তু আমার কাজ কি হবে?

এমন কিছু না। এই ধর চিঠি পোঁছে দিলে। পরীক্ষার হলে আনসার সাপ্লাই দিলে।

সেটা কি জিনিস?

শিখিয়ে দেব। গোপীস্যার হস্‌টেলে দরজা খুলে ঘুমোয়। রাত দু'টোয় মশারি তুলে তাকে একবার দেখা দিয়েই সরে আসতে হবে—পারবে?

আপনাদের হস্‌টেলে আর যাচ্ছিনে—

ভয় নেই, আমরা সব দেখিয়ে দেব। এখন তুমি থাক। বিকেলের আগে সব পেয়ে যাবে। হনুমানদা, তুমি এই পাকুড় গাছটার কাছাকাছি থেকো কিন্তু।

বিকেলের অনেক আগেই পাকুড় গাছতলায় চাল, ডাল, তেল, দা, কোদাল, মাটির হাঁড়ি, খড়, বালতি এবং আটখানা একটাকার নোট পৌঁছে গেল। টাকা ক'টা সরাতে আস্ফাকুলের কম কষ্ট করতে হয়নি। আব্বাজানের মাথার বালিশের নিচে মানিব্যাগ। তার ভেতরে একটাকার নোটের গোছা থাকে।

আব্বাজান কাৎ হয়ে ঘুমোচ্ছিল। আস্তে আস্তে ডান হাতের দু'আঙুলের ফাঁক গলিয়ে আব্বাজানের মাথার বালিশের নিচে পাঠাতে হয়েছে। টাকা সরিয়ে আবার সেই জায়গায় মানিব্যাগ রাখতে হয়েছে।

তবু আনন্দ। একটা আস্ত লোক—তাই বা কেন? —একেবারে

সার্কাসের একজন জোকার—যে কিনা এ-গাছ থেকে ও-গাছ লাফাতে পারে—বহুরূপী হয়ে লেজ লাগিয়ে পয়সা আয় করে—সে এখন তাদের মাইনে-করা লোক। চাই কি অর্ডার করলে হেডস্যারের হাতের বেত ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে হনুমানদা গাছে উঠে। পলকে হাওয়া হয়েও যেতে পারে। শুধু আদেশের অপেক্ষা। আস্ফাকুলের মনে হচ্ছিল—এ-জন্যে আট টাকা সরানো কিছু না। আরও কোন কঠিন কাজ থাকলে তাও করে ফেলতে পারত।

শাবলও জোগাড় ছিল। সন্ধ্যের আগেই হনুমানদার ঘর প্রায় উঠে গেল। সব জায়গায় খড় চাপানোর কাজ তখনো শেষ হয়নি। কালকের দিনটা হাত লাগালে কাজ একদম কমপ্লিট হয়ে যাবে।

ওরা পাঁচজনে যখন হনুমানদার নতুন ডেরা থেকে বেরিয়ে এল তখন খালিশপুরের জঙ্গলের মাথায় চাঁদ। হনুমানদা মাটির হাঁড়িতে ভাত বসিয়েছে। অচিন্ত্য এক বালতি চাল সরিয়ে এনেছে। এখন তো কিছুদিন নিশ্চিন্ত।

সেদিন রাতে আস্ফাকুল বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখল, নদীর ঘাটে জল নিতে গিয়ে একজন গাঁয়ের মেয়েকে কুমির টেনে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অমনি তীরের কাছ থেকে হনুমানদা ঝাঁপ দিল। সোজা গিয়ে কুমিরের পিঠে চেপে বসল। কুমির যত ডুব দিতে চায়—হনুমানদাও তত ওর তলপেটে কাতুকুতু দেয়—আর কুমির ভাসতে বাধ্য হয়—কিন্তু মুখ থেকে মেয়েটাকে ছাড়ে না কিছুতেই। বেলা এগারোটা।

তলপেট পাথর হয়ে ছিল। পেচ্ছাপ করতে উঠতে হল আস্ফাকুলকে। কোথায় হনুমানদা। কোথায় কুমির। দূরে স্টেশনে মালগাড়ির ইঞ্জিন সান্টিং হল—তার আওয়াজ—ঘটাং।

ঠিক তখন নৃপেন স্বপ্ন দেখছিল—মহবুবদা ওদের পাঁচজনকে নিয়ে এস. এস. মাগুরায় করে নদী দিয়ে চলেছে। মাগুরায় ভোঁ কী সুন্দর। একদম বন্ধুর মত। ভৈরব ছেড়ে স্টীমার রূপসা নদীতে

পড়ল। তোলা-নোঙরের পাশে বসে ছিল হনুমানদা। চেঁচিয়ে উঠল সে। বর্ডার কোথায়? বর্ডার?

মহবুবদা বলল, কিসের?

কেন ভৈরবের? ভৈরব কোথায় শেষ—রূপসার কোথায় শুরু—একটা কোন দাগ থাকবে না? তা হয় নাকি?

মহবুবদা হেসে বলল, হনুমানদা, আমার মাথার পেছনের ম্যাপটা দেখ একবার, ভৈরব নীল লাইনে আঁকা—রূপসা লাল লাইনে আঁকা, ম্যাপেই ওদের শেষ—ম্যাপেই ওদের শুরু। নদীর জলে তো আর দাগ দেওয়া যায় না!

কথা বলতে বলতে স্টীমারের স্টীয়ারিং ঘোরাচ্ছিল মহবুবদা। গোঁফের জায়গাটা কামানো। তাই একমুখ হাসির সবটা বুক অবধি কালো চাপদাড়িতে ঢাকা পড়েনি। ঠিক তখন মহবুবদা তিমি তিমি বলে চেঁচিয়ে উঠতেই হনুমানদা ভল্ট খেয়ে জলে পড়ল। তার কাঁচাপাকা দাড়ি নদীর জলে ভিজে গেল। কালো লম্বা তিমিটা মাথার ওপর ফোয়ারা করে জল ছিটাচ্ছিল। নৃপেনের ঘুম ভেঙে গেল। দূর ছাই বাথরুম কোনদিকে?

সুধাকরবাবু সায়ান্স পড়ান। আর বিকেলে স্কুলেরই মাঠে কোদাল খোন্তা নিয়ে বাগানের ক্লাস নেন। মাটি কুপিয়ে দেয় হরি মালি। নিজের সবজি নিজে ফলাও স্কিমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিছু টাকা দিয়েছিল। সেই টাকায় হেডস্যার দেবেশ্বরবাবু এই ক্লাস খুলিয়েছেন। বিকেল বেলা ছুটির পর ক্লাস নেন সুধাকরবাবু। তাঁর অ্যাসিস্টান্ট হরি। সে-ই বাজার থেকে মরসুমি সবজির চারা, বিচি এনে দিয়েছে। এ-ক্লাসে পাঁচজন মনযোগী ছাত্রের নাম—নৃপেন আসফাকুল, অচিন্ত্য, হায়দার আর পবিত্র।

স্যার ধুলো-ধুলো মাটিতে পাকা কুমড়োর বিচি বসিয়ে দেখাচ্ছিলেন। পাশে সহকারী হরি। নৃপেন মাথা নিচু করে পায়ের ফাঁকের মাটি কোদালের বাড়ি দিয়ে গুড়ো করে নিচ্ছিল। বিকেল প্রায় শেষ। স্পোর্টসে ফোর ফর্টীর ট্রাক ঠিক করতে রোলার টানা হচ্ছে মাঠে। চোদ্দ পা দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থাতেই নৃপেন দেখল—হেডস্যারের সেই মেয়েটা হাতে টেস্ট পেপার নিয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। রোজ এই সময়টায় পড়তে যায়। এর নাম কণিকা। সবাই ডাকে কণা।

মাথা তুলে দেখার উপায় নেই। সুধাকর স্যারের কড়া নজর। সেই অবস্থাতেই—পায়ের ফাঁকে মাটি গুঁড়িয়ে ধুলো করার ভঙ্গীতে নৃপেন দেখতে পেল—নদীর বাতাসে কণার ফ্রকের ঘের দুলে উঠছে। হাতে টেস্টপেপার, মোটা খাতা, খাতার ভেতর বোধহয় বারো ইঞ্চির স্কেল। অতক্ষণ নিচের দিকে মাথা ঝুলিয়ে থাকা যায় না। মাথা ঘুরছিল নৃপেনের।

সুধাকর স্যার সন্ধ্যে হয়ে এলে তবে ওঠেন। কুমড়োর বিচি বসানোর মাদা কি করে করতে হয় তাই দেখাচ্ছিলেন। অচিন্ত্য

আর আসফাকুল তাই দেখতে দেখতে মাটিতে বসে পড়েছে। কাঁহাতক উবু হয়ে বসে থাকা যায়। এর ভেতর আসফাকুল আবার তার কুমড়োর বিচিটা হারিয়ে ফেলেছে। ধুলো ধুলো মাটির মধ্যে কোথায় যে সেঁধিয়ে গেল। মাথা-পিছু মোটে একটি করে বিচি বরাদ্দ। সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ায় সুধাকর স্যার সব গুটিয়ে ফেললেন। যাবার সময় আসফাকুলকে বলে গেলেন, তোমার বিচি তুমি খুঁজে বের করবে। ও আমি ছাড়ছিনে—রোজ রোজ বিচি হারানো—

স্যার চলে যাবার পরেও আসফাকুল খানিকক্ষণ খুঁজলো। কিন্তু কোথায় বিচি! এলোপাথাড়ি খুঁজতে গিয়ে ধুলো ধুলো মাটিতে নিরিখ দেওয়া জায়গাটাই হারিয়ে ফেলল আসফাকুল।

হোস্টেলের গায়ে নদীর ঘাটে হাত-পা ধুতে ধুতে নৃপেন বলল, আই লাভ কণা—

ওরা শুনতে না পাওয়ায় নৃপেন রিপিট করল, আই লাভ কণা। আমি কণাকে ভালবাসি।

হেডস্যার জানতে পারলে পেঁদিয়ে তোকে বেন্দাবন দেখাবেন—

আসফাকুল পবিত্রকে থামিয়ে দিয়ে বলল, এসব ব্যাপারে একটু আধটু বিপদ থাকেই। তার আগে নৃপেন তুই সিওর হয়ে নে—

কি ?

তুই কি সত্যিই কণাকে ভালবাসিস ? কেননা এসব ব্যাপারে ভুলও তো হয়—

অচিন্ত্য অবাক হয়ে যাচ্ছিল। একদম ব্লেকের মত কথা বলছে আসফাকুল। কি কি হতে পারে? কি কি না হতে পারে? দু'দিকই দেখে নিচ্ছিল আসফাকুল। অচিন্ত্যর মনে অন্য জন্যে একটা কষ্টও হল। নৃপেন তার ভালবাসার কথাটা সবার আগে তার কাছে ভাঙলো না কেন ? চাই কি একটা ক্লু ধরে সবার গোপনে সে নিজেই সবকিছু সমাধান করে দিতে পারত।

নৃপেন বলল, যদ্দিন চন্দ্রসূর্য আকাশে থাকবে—ততদিন আমি কণাকে ভালবাসব।

পবিত্র বলল, ভূ-ভূত হয়ে—

যা বুঝিস না তা নিয়ে কথা বলতে আসবি না বলে দিলাম। বলেই কোথাকার একটা শোনা লাইন—কোথায় যেন শুনেছে—যাত্রার বোধহয়—কিংবা কোন থিয়েটারে—সেটাই নৃপেনের এসে গেল মুখে, আমি কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি—

বাকি চারজন তো অবাক। এসব কি কথা নৃপেনের মুখে। এ ওর মুখের দিকে চাইছে দেখে নৃপেন এবার বেশ জোরেই বলল, কণাকে না পেলে আমি বাঁচব না।

আসফাকুল হেসে বলল, এই কথা। আচ্ছা তোকে দেব। এখন হাত-পা ধুয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি যা। সন্ধ্যে হয়ে গেল। তোর বাবা যা মারখুট্টে।

বাবা মারে মারুক। আমি কণাকে চাই। আই লাভ কণা।

কণাকে নিয়ে করবিটা কি?

বিয়ে করব।

স্কুলে পড়তে পড়তে?

আগে তো লোক অল্প বয়সে বিয়ে করত। আই লাভ কণা।

কণা জানে?

না।

কণাকে বল তাহলে।

কি বলব?

যা আমাদের বললি।

ওরে বাবা! হেডস্যার বাড়ি থাকলে তো ও সব বলা যাবে না। আর আমাকে দেখলে তো স্যার জ্বলে যান—

তাহলে?

একটা পথ বের করে দে আসফাকুল।

এমন কি কঠিন। ওদের তো মর্নিং স্কুল। হোক না আমাদের চেয়ে উঁচু ক্লাসের মেয়ে। আমাদের দুপুরে স্কুল। তুই আগে এসে স্যারের বাড়ির উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে থাকবি। আমরা আগের দিন রাতে পিচরাস্তার ওপর চক দিয়ে বড় করে লিখে রাখব—নৃপেন + কণা। ওর চোখে সেই লেখা পড়তেই তুই পাশ দিয়ে হেঁটে যাবি আর অল্প করে হাসবি—

তাহলে কি হবে?

বুঝবি 'লাভ' হয়েছে।

পবিত্র বলল, যদি ক্ষেপে যায়?

অচিন্ত্য তাকে ধমকে উঠলো, ক্ষেপলেই হল? পিচরাস্তার লেখাটা কণা তো ততক্ষণে পড়ে ফেলেছে—তার একটা কাজ হবে না? ইয়ার্কি!

আসফাকুল বলল, আজ তুই বাড়ি যা তাড়াতাড়ি। তোর মনটা ভাল নেই। হাজার হোক প্রেমে পড়েছিস তো। এই সময় অনেক কিছু হয়। দেখি তোর জন্যে কি করতে পারি। কণাকে স্টাডি করতে হবে। তোরা সবাই বাড়ি যা।

বাকি চারজন একা একা কেটে পড়ল।

যাবার সময় অচিন্ত্য বলল, হনুমানদার হেল্প নিলে হয়।

আসফাকুল বলল, কি ভাবে?

ধর যদি লাভ লেটার পাঠাতে হয়। হনুমানদা হেডস্যারের চোখে ধুলো দিয়ে ঠিক পৌঁছে দিতে পারবে—

গোপীস্যার যদি হনুমানদাকে সেই সময় দেখেই চিনে ফেলে? তাহলেই তো কেলোর কীর্তি বেধে যাবে। তখন হনুমানদার প্রাণ নিয়েই টানাটানি।

অচিন্ত্য আর কথা বাড়ালো না। হস্টেলের ডবল সিটের ঘরে নাইন টেন ইলেভেনের ভাল ভাল স্টুডেণ্ট পড়তে বসে গিয়েছে। আনন্দ আর কোনো চিঠি লেখেনি। তার 'অমঙ্গলের মঙ্গল'

উপন্যাস্খানাও বোধহয় ছাপা হয় নি আজও। জীবনটা গার্জিয়ানরা একেবারে বিষাক্ত করে দিয়েছে। এমন সুন্দর সন্ধ্যেবেলা। কত কথা মনে আসছিল অচিন্ত্যর। এই তো নদীর ঘাটে বসে গল্প করার সময়। অথচ বাড়ি বাড়ি সবাই পড়তে বসে গিয়েছে। এখুনি গিয়ে লুকিয়ে চিলেকোঠার ঘরে যেতে হবে। বাবা বৈঠকখানা থেকে উঠে এসে দেখবে—তার অচিন্ত্য কেমন সুন্দর অনেকক্ষণ ধরে পড়ছে। তার গায়ের ওপর তখন বাবার ছায়াটা পড়বে। ছায়ার মুখে যদি হাসি ফুটতো তাহলে তাও দেখা যেত তখন।

আস্ফাকুল স্কুল-মাঠে নেমে পড়ে হেডস্যারের কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে গেল। সামনের দু'খানা ঘরই অন্ধকার। ভেতরের দরদালানে মাদুরে বসে কণা। হাতে ছুঁচসুতো। একটা ফ্রেমে কাপড় লাগিয়ে ফোঁড় তুলছে। আস্ফাকুল অবাক হয়ে গেল। এই তো খানিক আগে কোচিংয়ে গেল টেস্ট পেপার হাতে। ফিরলো কখন? কোন্ পথ দিয়ে? ছোট একটা ঢিল ছুঁড়লো বাড়ির ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে লোমে ঢাকা বিচ্ছু কুকুরটা চেঁচিয়ে উঠল। বুঝলো গতিক সুবিধের নয়। নয়ত ভেবেছিল, ছোট্ট ঢিলের শব্দতে কণা ছুঁচ হাতে উঠে এলে এটা-সেটা বলে নৃপেনের কথাটা পাড়বে। অবশ্য তার আগে দেখে নিত—স্যার বাড়ি আছে কি না।

কুকুরটা তার দিকেই ছুটে আসছে দেখে আস্ফাকুল এক ছুটে একদম মাঝ-মাঠে এসে দাঁড়াল। তখনো হাঁফাচ্ছিল। চারদিক অন্ধকার মত। স্পোর্টসের ফোর ফট্টির সাদা ট্রাকে তখন ইলেভেনের রবীনদা দাঁড়ানো। সঙ্গে ক্লাস টেনের দু'জন। ইয়া চওড়া বুক। সবাই তাঁকে কণার লাভার বলেই জানে। কেননা, দুর্গাপুজোর ভাসানের দিন দু'জনকে এক সঙ্গে জেলখানার ঘাটে দেখা গিয়েছিল। অ্যানুয়াল প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউসনের সময় রবীনদা স্টেজে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। বুকের ওপর একটা বড় বাংলা পান জল দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়। আর ব্যায়ামবীর নবকান্তবাবু একখানা

রাবদা ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে আসেন। এসেই এক কোপ। পানের পাতাটা দু'টুকরো। রবীনদা হাসতে হাসতে উঠে বসে।

সেই রবীনদাই আস্ফাকুলকে বলল, হাঁফাচ্ছিস কেন ?

দৌড়োচ্ছিলাম।

দৌড় প্র্যাকটিস করছিস ?

এমনি দেখছিলাম—

এই ট্র্যাক ধরে এক পাক দিয়ে আসতে পারবি ?

কি দেবে ?

ক্লাস টেনের দু'জন বলল, একটা দশ পয়সা। কিন্তু একটা কণ্ডিশন আছে—

আস্ফাকুলের তখন জেদ চেপে গেছে। কি কণ্ডিশন।

প্যাণ্টটা খুলে মাথায় বেঁধে ট্র্যাক ধরে এক পাক দিতে হবে—

মোটে দশ পয়সায় ! ল্যাংটো হব !

এবার রবীনদা বলল, বেশ একটা আধুলি দেব। পারবি ?

খুব ! এই ছাখোনা। বলতে বলতে আস্ফাকুল প্যাণ্টটা খুলে মাথায় টুপির মত বসিয়ে নিল। পয়সা দাও—

আগে দৌড়ো।

দেবে তো ?

দৌড়ে দেখনা—

অমনি আস্ফাকুল প্রায় অন্ধকার মাঠে সাদা চুনের দাগ লাগানো ঘাসের ওপর গোল ট্র্যাক ধরে পাঁই পাঁই দৌড়তে লাগল। আজ যেন তার কি হয়েছে। কিছু একটা জিততেই হবে। অর্ধেকও দৌড়োয় নি—এমন সময় একটা ঝলক্ দিয়ে আলো এসে পড়ল তার গায়ে। দৌড়োতে দৌড়োতেই আস্ফাকুল বুঝলো এ তো টর্চের আলো। ফোকাস ঠিক তার পেছনে এসে পড়েছে। রবীনদার হাতে তো কোন টর্চ ছিল না।

খচ করে গোলপোস্টের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়ল আস্ফাকুল।

অনেক দূরে ক্লাস সেভেনের কাছ থেকে টর্চের ফোকাস মারছে কে। প্রথমে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বাঁ হাত ঝুলিয়ে দিয়ে ঢাকতে হয়েছে। ফোকাস নিভতেই ডান হাত দিয়ে চোখ ডলে আস্ফাকুল দেখতে পেল—হেডস্যার দেবেশ্বরবাবু আর কণার মা—দু'জনেরই সাদা জামাকাপড় দূরে ঝাপসা মত—অস্পষ্ট—ওঁরা এই সময়টা বেড়াতে বেরোন। হেডস্যারের বাঁ হাতে থাকে লাঠি। ডান হাতে টর্চ। দূর থেকে ভেসে এল—কে দৌড়োয় ধর্ তো—

আর দাঁড়ায়। আসফাকুল ছুটে আড়াল খুঁজতে লাগল। কোথায় লুকোয়? দাঁড়িয়ে প্যান্টটা পরে নিতে পারত। কিন্তু দাঁড়ালে যে স্যার চিনে ফেলতে পারে। তাই থামতে পারছিল না। শুনেছিল সাপ এঁকেবেঁকে ছোটে। তাহলে নাকি ধরা পড়ে না। টর্চের ফোকাসকে ফেল পড়ানোর জন্যে আসফাকুলও এঁকেবেঁকে ছুটছিল। সেই অবস্থায় তো প্যান্ট পরে নেওয়া যায় না। ট্র্যাকের আধখানা ছুটেই অন্ধকারে আসফাকুল আন্দাজে একটা লংজাম্প দিল। স্কুল কম্পাউণ্ডের বাইরের নালাটা টপকে একদম রাস্তায়। তার ওপারেই হস্টেল। খেয়াঘাট। আমবাগান।

আসফাকুল আশশ্যাওড়ার জঙ্গলের ভেতরে হেঁচড়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল। এখানে এখন হেডস্যারের টর্চের ফোকাস পৌঁছতে পারবে না।

পরদিন স্পোর্টসে বিগড্রাম বাজালো হায়দার। সবার আগে। একদম পেছনে পবিত্র। হাতে ঝাঁঝর। মাঝখানে ওরা তিনজন। নৃপেন, আসফাকুল, অচিন্ত্য। বগলে ব্যাগপাইপ। সামিয়ানার নিচে হেডস্যার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, তার বউ আর একদিকে কণা। আজ শাড়ি পরেছে। নৃপেন ড্রামের তালে তালে হাঁটছিল। ফুঁ দিয়ে ব্যাগপাইপের পেটটা বগলের ভেতর ফুলিয়ে ফেলেছে। হাঁটু অবধি মোজার ওপর দু'পায়েই লালফিতে বেঁধেছে পাঁচজনই।

আলি-স্যার চেয়ারে বসে বসেই ওদের বাজনার তালে তালে মাথা নাড়ছিলেন। এই পাঁচটা ছেলেকে তাঁর ভীষণ ভাল লাগে। কি সুন্দর বাজাচ্ছে ছাখো।

ওরই ভেতরে আসফাকুল ফোলা মুখে বড় চোখে নৃপেনের দিকে তাকালো। নৃপেন সেই চোখ ফলো করে দেখলো—কণা একখানা কলাপাতা রঙের শাড়ি পরে বসে আছে।

আস্ফাকুল বলেছিল, খুব মোলায়েম করে তাকাবি। বেশ দুঃখু দুঃখু ভাব থাকবে চোখে মুখে। সেই কথামত নৃপেন ব্যাগপাইপে ফুঁ-দেওয়া গালফোলা অবস্থায় যতটা পারে চোখে দুঃখ এনে কণার দিকে তাকালো। তাকাতে গিয়ে নৃপেন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ব্যাণ্ডপার্টির নিয়ম—একজন দাঁড়িয়ে পড়লে বাকি সবাই দাঁড়িয়ে যাবে। তাই হল। ওরা পাঁচজন সেখানে দাঁড়িয়েই বাজাতে লাগল। চোখ হেডস্যারের দিকে। বাজনা শোনাচ্ছিল কণাকে। সে-বাজনা শুনে আলি-স্যার চেয়ারে বসে দুলছিলেন।

কসরৎ কিছু দেখাচ্ছিল হায়দার। জয়ঢাক বাজানোর কাঠি দু'টো শূন্যে তুলে এক একবার বাতাসের ভেতর দোলাচ্ছিল। আবার তালের জায়গায় এসে গদাম্ করে ঢাকে বাড়ি দিচ্ছিল। ঝমঝম—ঝমরঝম বলে সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঝাঁঝর বাজাচ্ছিল পবিত্র। মাঝখানে ওরা তিনজন পায়ে তাল রেখে ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছিল। আর নৃপেন খুব করুণ করে ওরই ভেতর কণার দিকে তাকাচ্ছিল।

আসফাকুল একসময় দেখল, কণা পালটা কটমট করে তাকাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হায়দার আবার স্টার্ট দিল। হেডস্যারের সামনের টেবিলে সাজানো কাপগুলো রোদে ঝকঝক করছিল।

ওরা তালে তালে বাজাতে বাজাতে সামিয়ানার পেছনে এসে দাঁড়াল। সেখানটাই গ্রীনরুম বলা যায়। ভিড়ের পেছনদিক আর কি! একদিকে হেডস্যারের কোয়ার্টারের উঁচু দেওয়াল।

বুক থেকে বিগড্রামের স্ট্র্যাপটা খুলতে খুলতে হায়দার বলল, কণা তো নৃপেনের দিকে তাকাচ্ছিল।

আসফাকুলকে কিছু গম্ভীর লাগল। তে-নলা ব্যাগপাইপটা ঘাসের ওপুর রেখে খুব আস্তে বলল, হুঁ। কটমট করে তাকাচ্ছিল।

নৃপেন বলল, কি হবে তাহলে—

তুই তো গো অ্যাজ ইউ লাইকে নাম দিয়েছিস—

হ্যাঁ।

দেখি কি করা যায়। হনুমানদাকে তো আসতে বলেছি।

বেলা চারটেয় গো অ্যাজ ইউ লাইক শুরু হল। এই আইটেমটা শেষ হলেই প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউসন শুরু হবে। এক একজন এক এক সাজে সেজে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল। ক্লাস টেনের বিষ্ণু সেজেছে পুলিশ ইন্সপেক্টর।

হনুমানদা বেলা আড়াইটার ভেতর এসে গেছে। পাছে গোপী স্যার চিনে ফেলে তাই হনুমানদা এমনি আসে নি। সেও ছদ্মবেশে এসেছে। হরি মালির ঘরে গো অ্যাজ ইউ লাইকের গ্রিনরুম। সেখানে বসে হনুমানদা নৃপেনকে সাজিয়ে দিল। হাতে নারকেলমালার ভিক্ষাভাণ্ড। গলায় পুঁতির মালা। পরনে পা অবধি কালো আলখাল্লা। মাথার চুলগুলো পাউডার ছড়িয়ে হনুমানদা এক মিনিটে পাকিয়ে সাদা করে দিল। হনুমানদা নিজে তখনো সাধুর ছদ্মবেশে বসে।

'মুশকিল আসান!' বলে হাঁক ছেড়ে নৃপেন একদম হেডস্যারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। খাঁটি দরবেশের ভঙ্গী। নারকেলমালায় হেডস্যার একটা দশ পয়সা দিলেন ঠক করে। সেই উৎসাহে নৃপেনও কণার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েই আর একটা হাঁক দিল। 'মুশকিল আসান।' এইভাবেই হাঁক দিতে শিখিয়েছে হনুমানদা।

ফল হল বিপরীত। কণা ঝুঁকে পড়ে ছোট একটা ঢিল ফেলে দিল নৃপেনের নারকেলমালায়। তাই দেখতে পেয়ে অনেকে একসঙ্গে

হেসে উঠল। ভিড়ের ভেতর থেকে খুব আস্তে আস্তে আসফাকুল অচিন্ত্যকে বলল, 'গতিক খারাপ—'

নৃপেন ঘাবড়ে গিয়ে কি করবে বুঝতে পারছিল না। সবাই তার দিকেই তাকিয়ে হাসছে। তবু তারই ভেতর নৃপেন আরেকবার নকল দাড়িতে বাঁ হাতখানা বুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'মুশকিল আসান!'

তাতে ফল আরও খারাপ হল। কণা একদম সোজাসুজি ফিক করে হেসে ফেলল। ঠিক সেই সময় পুলিশ ইন্সপেক্টরের ছদ্মবেশে বিষ্ণু এসে বেশ দাপটে নৃপেনের বাঁ হাতখানা চেপে ধরল, 'আই উইল সার্চ ইউ—তোমাকে অ্যারেস্ট করলাম।'

এত সবের জন্যে নৃপেন তৈরী ছিল না। কণার হাসিতেই ও ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারপর পুলিশ ইন্সপেকটরের মুখে অ্যারেস্ট শুনে নৃপেন সব গোলমাল করে ফেলল, 'আমি তো কিছু করিনি।'

'হ্যাঁ করেছো। দেখি তোমার আলখাল্লার ভেতর কি আছে?'

বিষ্ণুর টানাটানিতে আলখাল্লার নীচের দিকটা খসে পড়তেই সামিয়ানা বোঝাই লোকের সামনে হাফপ্যাণ্ট পরনে নৃপেনের হাঁটু দু'খানা বেরিয়ে পড়ল। অথচ তখনো গালে দাড়ি। মাথায় পাকা চুল।

একদম কেলোর কীর্তি।

নৃপেন আলখাল্লা থেকে বেরিয়ে চোঁ চাঁ দৌড়। একদম নদীর ঘাটে। হসটেলের আমবাগান পেরিয়ে। তখনো সামিয়ানা সুদ্ধ লোকের হাসি হা হা করে ভেসে আসছিল। খানিকবাদে হনুমানদাকে সঙ্গে নিয়ে আসফাকুল ওরা সেখানে এসে হাজির হল।

'অমন দৌড়তে আছে? একটা উপস্থিত বুদ্ধি নেই তোমার! কি করলে বল তো দাদাবাবু।'

হনুমানদার সব কথা শুনতে পাচ্ছিল না নৃপেন। নিজে নিজেই

বলল, 'সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল হনুমানদা। কণা যে এমন করে হেসে দেবে ভাবি নি। 'মুশকিল আসান!' বলে তুমি যেমন শিখিয়েছিলে তেমন চেঁচাচ্ছিলাম—'

এতক্ষণে আসফাকুল প্রথম কথা বলল, 'একটা কিছু করতে হয় হনুমানদা। নৃপেন কণার লাভে পড়েছে।

'কি?'

'কণাকে নৃপেন ভালবাসে।'

'ও।' কি যেন ভেবে নিল হনুমানদা। 'কণা তা জানে?'

'জানাবার চান্স পেলাম কোথায়! যে রকম কটমট করে তাকাচ্ছিল।'

নৃপেনকে থামিয়ে দিয়ে অচিন্ত্য বলল, 'আজই রাতে হেডস্যারের বাড়ির সামনের রাস্তায় চক দিয়ে বড় করে লিখে রাখব—নৃপেন + কণা—নিশ্চয় কাল সকালে মর্নিং স্কুলে যাবার সময় কণা দেখতে পাবে। তাহলেই জানতে পারবে।'

'তাহলেই চিত্তির। হেডমাস্টার মশাই প্রথমেই নৃপেনকে পেটাবে। ভীষণ সাবধান হয়ে যাবে।' এখানে থেমে হনুমানদা কি যেন ভেবে নিয়ে নৃপেনকে বলল, 'কণাকে না ভালবাসলে হয় না।'

'হয় না হনুমানদা। আমি ভীষণ লাভে পড়েছি।'

'কি করে বুঝলে? শুনলাম মেয়েটাতো তোমার চেয়ে উঁচু ক্লাসে পড়ে। তাছাড়া তুমি তো এখনো হাফপ্যাণ্ট পরো।'

'তাতে কি? ধুতি পরব কাল থেকে। উঁচু ক্লাসে পড়লেই হল। ও তো আমার চেয়ে ছোট।'

'ধর কণার সঙ্গে তোমার লাভ হল—'

'ধরব কি! হয়েছেই তো হনুমানদা।'

'ধরলাম কণাও তোমাকে লাভ করে—'

'সে হলে তো কথাই নেই। তোমার বুদ্ধি দিয়ে করিয়ে দাও না—'

'দিলাম করিয়ে। তারপর?'

'তারপর মানে?'

'তারপর কি করবে?'

'কি আর করব। ভালবাসব।'

'বাসলে। তারপর?'

'হেঁয়ালি রাখো হনুমানদা। আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'হেঁয়ালি নয়। ভালবাসাবাসি করবে কি করে?

'বিয়ে করব। এ তো সোজা কথা!'

'এই হাফপ্যাণ্ট পরে?'

'বললাম তো ধুতি পরে নেব।'

'হাফপ্যাণ্টের ওপর?'

'তুমি হাফপ্যাণ্ট হাফপ্যাণ্ট করছ কেন?'

'করছি এজন্যে—এখন বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যেতে পারবে? তোমার বাবা পেটাবে না?'

'এই কথা! সে তখন দেখা যাবে। দরকার হলে আলাদা হয়ে গিয়ে থাকব।'

থাকতে পারবে? ঘরভাড়া। সংসার খরচ। পয়সাকড়ি পাবে কোত্থেকে?'

অতদূর অবশ্য ওরা কেউ ভাবেনি। তবু নৃপেন বলল, 'দরকার হলে খালিশপুরের জঙ্গলে আমরা আলাদা ঘর করে থাকব। বাঁশের খুঁটি। খড়ের চাল। বনের ফল। আর তুমি তো আছ। সবাই মিলে হেল্প করবে না?'

'আমার কথা বাদ দাও। আমি তো ক্লাউন। হেডমাস্টারের মেয়ে থাকতে রাজী হবে জঙ্গলে?'

'থাকবে না মানে? ভালবাসায় সব হয় হনুমানদা।'

'হলে ভাল! কিন্তু ধর যদি হেডস্যার থানা-পুলিশ করেন?'

'খালিশপুরের জঙ্গলে খুঁজে পাবে আমাদের?'

'আমাদের মানে?'

'আমি। কণা। তোমরা সবাই—'

'পুলিশ সঙ্গে ব্লাডহাউণ্ড নিয়ে জঙ্গলে ঢুকবে। গন্ধ শুঁখে কুকুর আমাদের ধরিয়ে দেবে।'

'তাহলে তুমি আছ কি করতে?'

'আমি আর আছি কোথায়? আধপেটা খেয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকি। চাল ডাল যা দিয়েছিলে সব ফুরিয়ে গেছে। হাতের টাকাও প্রায় কাবার। এখন মোটে দু টাকার একখানা নোট আছে।'

এ-ক'দিন কণার কথায় মেতে থাকায় ওরা পাঁচজন হনুমানদার কথা একদম ভুলে বসে আছে। আসফাকুল বলল, 'ভেরি সরি' হনুমানদা। কাল সকালের ভেতর তোমায় টাকা পৌঁছে দেব। তুমি এখন একটি পথ বাতলে দাও। কণার মনটা যাতে নরম হয় এমন একটা পথ। দেখছো তো নৃপেনের অবস্থা—'

হনুমানদা অনেক ভেবে বলল, 'খুব ঘাঁটাবি না। আবার সব সময় চোখের সামনে থাকবি। এই ধর গল্পের বই দিয়ে এলি। কিম্বা সাইকেলে পাস করার সময় ওর কাছাকাছি এক কলি গান গেয়ে দিলি—'

অচিন্ত্য বলল, 'মন্দ বলনি।'

বাগড়া দিল পবিত্র, 'তাতে যদি হিতে বিপরীত হয়। তখন ঠে-ঠেলা সামলাবে কে?'

অচিন্ত্য চেঁচিয়ে বলল, 'তোমায় কেউ ঠে-ঠেলাগাড়ি ঠে-ঠেলতে ডাকবে না।'

সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। হনুমানদা নদীর ঘাটের পথ ধরে জেলখানার ঘাট বাঁয়ে ফেলে একা একা খালিশপুরের জঙ্গলের পথ

খরল। যাবার সময় বলে গেল, শেষ দু'টাকা ভাঙিয়ে আজ চিন্তাহরণ হোটেলে ভাত খাব। কাল সকাল থেকে কিন্তু লবডঙ্কা।

'সে তোমায় ভাবতে হবে না।' বলেও আসফাকুলের মনে চিন্তা ধরে গেল।

বিপদ যখন আসে তখন সব দিক দিয়েই আসে। একদম একসঙ্গে। একদিকে হনুমানদার জন্যে চালডাল জোগাড় করা দরকার। নয়ত টাকা। সব সময় আম্মাজানের হাতব্যাগ থেকে হাতানো সম্ভব নয়। আজকাল আবার গুনেগেঁথে রাখে। অবশ্য সেটা খুব বড় চিন্তার কথা নয়। কাছারিপাড়া এখন নির্জন। কিংবা বেনেখামারের শেষ দিকটা। সেদিক থেকে মিউনিসিপ্যালিটির লাইটপোস্ট থেকে পর পর দশটা ডুম খুলে নিতে পারলেই হল। মইত্তা তো এসব জিনিস কিনে নিতে রেডি সব সময়। কিংবা নদীর ঘাটে বাতিল টেলিফোনের লাইন আছে। পোস্ট বেয়ে উঠে প্লাস দিয়ে তার কেটে নিলেই হল। তারপর ঝেড়ে দাও।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে নৃপেনকে নিয়ে। হাত পা ভাঙলে বোঝা যেত। জ্বর হলেও বোঝা যায়! কিন্তু এ কি জিনিস রে বাবা। সারাদিন শুধু কণা! কণা!! গায়ে জোর পায় না। মনের জোরও যেন হারিয়ে ফেলেছে নৃপেন। তারকাটা কিংবা ডুম খসানোতে ওর আর যেন মন নেই। অথচ হনুমানদার মত আস্ত জ্বলজ্যান্ত একটা লোকের খরচ তো চালাতেই হবে। আর এরকম সুযোগ ক'জন পায়? বড় সারকাসের ক্লাউন এখন তাদের কাজে আছে। শুধু খাওয়া দাওয়া চালিয়ে যাওয়া। পুজোর সময় অবশ্য একখানা ধুতি চেয়েছে হনুমানদা। তখন নাকি দিতেই হবে। কাজের লোক রাখলে নাকি দেবার নিয়ম।

সেদিন—এইতো ক'দিন আগে হনুমানদার ডেরায় ওরা পাঁচজনে গিয়েছিল। হনুমানদা প্রায় টারজনের মত বড় সিঁদুরে আমগাছটার গায়ের বুনো লতা শক্ত করে ধরে এক ঝুল খেয়ে একদম দূরের

একটা আমগাছের উঁচু ডালে গিয়ে বসল। ওদের অবাক করে দিয়ে আবার নেমেও এল।

সব রকম দড়ির খেলা শিখে নাকি পাকা হবার পর—শেষমেশ লোকে ক্লাউন সাজে সারকাসে। হনুমানদা হল তাই। ক'টা টাকার অভাবে এমন লোককে ছেড়ে দেওয়া যায়। নয়ত হনুমানদার কাজের অভাব আছে নাকি। যে-কোন সারকাসের দল ওকে পেলেই লুফে নেবে। চাইকি মোটা টাকা মাইনে দিয়েই নিয়ে যাবে। হনুমানদা নিজেই বলছিল, আর ক'টা দিন দেখবে। তারপর চলে যাবে। এই খাওয়ার কষ্ট সে সইতে পারে না।

এমন লোককে কিছুতেই ছাড়া যায় না। সামনেই টারমিনাল পরীক্ষা। স্যান্সক্রিটের দিন ব্যাকরণ কৌমুদী থেকে ধাতুরূপ সাপ্লাই দেবে কে? হনুমানদার সঙ্গে কেউ পারবে? কোত্থেকে ঝুল খেয়ে এসে এগজামিনেশান হলে ঢুকবে। সেকেণ্ডের ভেতর সাপ্লাই দিয়ে গায়েব হয়ে যাবে।

এতক্ষণে হয়ত সাধুর ছদ্মবেশে হনুমানদা চিন্তাহরণ হোটেলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। 'জয় ভোলে বাবা।' বলে খেতেও বসে পড়তে পারে।

কিন্তু মুসকিল হয়েছে নৃপেনকে নিয়ে। 'এই উঠবি তো।'

'না।'

'সন্ধোবেলা নদীর ঘাটে বসে থাকবি একা একা। আমরা তো যে-যার বাড়ি যাব এখন। আব্বাজান ঘুমোলে তবে ড়ুম খসাতে বেরোবো। হনুমানদার হাতে টাকা নেই আর। মনে থাকে যেন—'

এসব কথায় একদম কান দিল না নৃপেন। আসফাকুল আরেকবার বলতেই নৃপেন বলল, 'আমি আর বাড়ি ফিরছি না।'

'কোথায় যাবি।'

নদীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি আর এ জীবন রাখব না।'

'কি করবি ?'

'আত্মহত্যা।'

অচিন্ত্য, পবিত্রর সঙ্গে এই প্রথম হায়দার মুখ খুলল, 'এসব সময় এরকম মনে হয়। যে-কোন ব্যাপার ঘটে যেতে পারে। একটা সামান্য নারী—,

শেষের লাইনটা কোথায় যেন কোন্ যাত্রায় বোধহয় শুনেছিল হায়দার। তাই জুৎসই জায়গা দেখে লাগিয়ে দিল। এতক্ষণে স্পোর্টস হয়ে গেছে। স্কুলের মাঠ সন্ধ্যার অন্ধকারে নিশ্চয় খা খা করছে। নদীর বুকের ওপর দিয়ে হু হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। পবিত্রর মনটাও হু হু করে উঠল। আত্মহত্যা করলে নৃপেন চিরকালের মত চলে যাবে। আর আসবে না নৃপেন। সে কি করে হয় ? 'তো-তোর কি চাই বল ?'

নৃপেন নদীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একখানা সাইকেল।'

আসফাকুল চমকে উঠল, 'সাইকেল ? সাইকেল দিয়ে কি করবি ?'

'এখুনি চাই একখানা সাইকেল। ঠিক এই সময়টায় কণা অঙ্কস্যারের বাড়ি যায় বই নিয়ে। সঙ্গে থাকে সিক্সের সনতের দিদি—টগর। দু'জনেই শাড়ি পরে যায়—এখুনি একটা সাইকেল চাই। এখুনি।'

'এখুনি কোথায় পাব !'

'এখুনি দরকার। ফরেস্ট অফিসের সামনে দিয়ে ওরা দু'জন মোড় ঘুরে অঙ্কস্যারের বাড়ি যায়। বোধহয় কোচিং নেয়—'

হায়দার বলল, 'সাইকেল জোগাড় হয়ে যাবে। বিজয় মোদকের দোকানে ভাড়া খাটায়। কিন্তু সাইকেল দিয়ে—'

অচিন্ত্য সারা ব্যাপারটায় একটা রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেল। বলল, 'একদম দেরী নয়। এক্ষুনি বিজয় মোদকের দোকানে চল।

বাকিতে নেব। সাইকেল ফেরত দেওয়ার সময় ভাড়া দিলেই চলবে। চল—'

সবাই অন্ধকারে যেন আশার আলো দেখতে পাচ্ছে এই ভাবে কাঁটাগাছ, আঁশশ্যাওড়ার ঝাড় মাড়িয়ে পিচরাস্তায় উঠে এল।

সন্ধ্যায় হ্যাজাক ঝুলিয়ে বিজয় মোদক সাইকেলের দোকান খুলে বসেছিল। পাঁচমূর্তিকে একসঙ্গে দেখে কোণে হেলান দিয়ে রাখা একটা লাল রঙের সাইকেল দেখিয়ে বলল, 'নে যাও। মনে থাকে যেন—ঘণ্টা দেড় টাকা।'

স্কুল থেকে বেরিয়ে বড়রাস্তা গিয়ে ফরেস্ট অফিসকে বাঁয়ে ফেলে কাছারিপাড়ায় থেমেছে। সেখানে কোর্টের যত লোক বটতলায় বাঁশের বেঞ্চে বসে। এখন সন্ধ্যা-বেলা। বটতলায় কেউ নেই। শুধু অচিন্ত্য দাঁড়ানো। হাতে একটা আড়বাঁশি। কণা আর টগর রবার গাছটার ওখানে বাঁক নিচ্ছে দেখলেই সে বাঁশিতে ফুঁ দেবে। আর অমনি উল্টো দিক থেকে নৃপেন বাঁই বাঁই করে সাইকেল চালিয়ে আসবে। তারপর ?

আসফাকুল হনুমানদার জন্যে টাকার জোগাড়ে লাইটপোস্টের ডুম খুলতে বেরোবার আগে হায়দারকে বলে গেল, তুই আর পবিত্র হেডস্যারের বাড়ির সামনে পিচরাস্তায় বড় করে লিখবি—কণা+ নৃপেন। পারবি তো ?

খুব পারব।

পবিত্র বলল, শেষে যদি ফল খারাপ হয়—

হলে দেখা যাবে—বলে আসফাকুল হায়দারকে বলে ডিরেকশন দিল। কোত্থেকে চকখড়ি পাওয়া যাবে। হেডস্যারের অফিসঘরের জানালায় কোন খড়খড়ি ভাঙা—সেখান থেকে হাত গলিয়ে বাঁ দিকে ছ'ইঞ্চি এগোলেই চকের বাক্স থাকে ইত্যাদি।

সন্ধ্যেবেলায় সাইকেলের সঙ্গে সঙ্গে নৃপেন তার বাবার একখানা ধুতিও জোগাড় করেছে। হাফপ্যান্টের ওপর মালকোঁচা দিয়ে পরতে

হয়েছে। পেছনের কাছা বেশ মাপসই পেখমের মত ফোলানো। এই অবস্থায় সাইকেল চালিয়ে কণার পাশ দিয়ে পাস করতে হবে। তখন। তখন মনের কথা বলে দাও।

অচিন্ত্য বাঁশিতে ফুঁ দিতেই মসজিদের দিক থেকে নৃপেন সাইকেল স্টার্ট দিল। ফরেস্ট অফিসের সামনে এসে বাঁক নিতে গিয়ে নৃপেন সনতের বোন টগরের পাশে কণাকে আবছামত দেখতে পেল। এই সময়টা কণা শাড়ি পরে। তাই দেখে নৃপেনের বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠল। কোণেই রবার গাছ। অন্ধকারে দাঁড়ানো। মোটা গুঁড়ি। খুব স্টাইলের মাথায় নৃপেন সাইকেলে বাঁক নিল। ঠিক কণার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অন্ধকারে ইংরেজীতে বলে দিল : আই লাভ ইউ—

আরও কি যেন বলার ছিল নৃপেনের। কিন্তু চান্স পেল না। স্পিডের মাথায় সাইকেলে কাৎ হয়ে মোড় ঘুরতে ঘুরতে মনের ভেতর ট্রানশ্লেসন করছিল নৃপেন। তোমাকে না হলে বাঁচবো না— ইংরেজীতে হলে কি বলবে? সেই ট্রানশ্লেসন, শাড়ি-পরা কণা, স্পিডের মাথায় মোড় ঘোরা, অন্ধকার—সব মিলিয়ে চলন্ত সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ার সময় নৃপেন সেই অন্ধকারেও পরিষ্কার দেখতে পেল—কণা আর টগর হো হো করে হাসতে হাসতে তাদের হাঁটার স্পিড্ বাড়িয়ে দিল শুধু। আর কিছু নয়। এত রিস্ক নিয়ে শেষে এই এফেক্ট মাত্র।

নৃপেনের সাইকেল স্কিড করেছে। সে ছিটকে রবার গাছের গুঁড়ির ওপর গিয়ে পড়েছে। অচিন্ত্য এখনো এসব কিছুই জানে না। সে তার বাঁশিতে সিগন্যাল দিয়ে যাচ্ছিল। নৃপেনের ওঠার উপায় ছিল না। হাঁটু, কনুই—নিশ্চয় ছাল উঠেছে। ধুতির দফা গয়া। সাইকেলটা এই অন্ধকারে কোথায় গেল।

বাঁশি বাজাতে বাজাতে অচিন্ত্য এক সময় মোড়ের মাথায় এসে খুব চাপা গলায় নৃপেন-নৃপেন বলে ডাকতে লাগল। কোথায় নৃপেন।

চোখ ডলে রবার গাছের গুঁড়ির দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল অচিন্ত্য। মিষ্টার ব্লেক—

স্মিথ, আমি উঠতে পারছি নে—

অচিন্ত্য এক লাফে তার টপকে গিয়ে নৃপেনকে ধরল। নৃপেন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গিয়ে পিচরাস্তার ঘাসের জমিতে বসে পড়ল। অচিন্ত্য তখন সাইকেলটা খুঁজে এনে রাস্তায় তুলেছে। বিশেষ ভাঙেনি। শুধু সামনের চাকাটা একটু টাল খেয়েছে। টাল ঠিক করতে করতে অচিন্ত্য বলল, কণা কোন রিপ্লাই দিয়েছে?

নৃপেন হাঁটুর ব্যথায় তখন চিঁ চিঁ করছিল। বলল, দিয়েছে। কিন্তু কি দিয়েছে তা আদৌ বলল না।

ভাঙা সাইকেল খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিজয় মোদকের দোকানে নিয়ে চলল দুজনে। আগে স্মিথ। পেছনে ব্লেক। সামনের চাকার টিউব গেছে। সেই অবস্থায় নৃপেন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, যদি হেডস্যারের জামাই না হতে পারি—তবে আমার নাম নৃপেন দত্ত চৌধুরীই নয়। দরকার হলে আমি অ্যানুয়ালে ফার্স্ট হব। স্পোর্টসে হাই জাম্প দেব ছ' ফুট। তখন? তখন না বলতে পারবে দেবেশ্বর মুখার্জী? তুই দেখে নিস অচিন্ত্য।

অচিন্ত্য শুধু বলল, ইয়েস বস্। সে তখন ভাঙা সাইকেলটা ঠেলছিল। এখন ভাড়া দেবে কোত্থেকে?

ঠিক এই সময় আসফাকুল বেনেখামারের শেষ লাইটপোস্ট থেকে ডুম খুলতে খুলতে শহরের দিকে আসছিল। গরম ডুম। প্যাঁচ দিয়ে খুলতে হয়। লাইটপোস্টগুলো স্লিপারি। বেনেখামারের শেষেই ধানক্ষেত। খাল। পুকুর। গ্রাম। কুকুরের ডাক।

মইদ্দা দরাদরি করে এগোরোটা ডুম ন টাকায় কিনলো।

হায়দার আসফাকুলের কথামত হেডস্যারের ঘরের জানালার ভাঙা খড়খড়ি খুঁজছিল। সঙ্গে পবিত্র এত তোতলাচ্ছিল—সেই

আওয়াজে আলিজান ছুটে আসতেই দু'জনকে গা-ঢাকা দিতে হল। হায়দার বুঝলো আজ আর পিচরাস্তায় লেখার কোন চান্স নেই।

সাইকেলের দোকানে বিজয় মোদক তখন চেঁচাচ্ছিল। সাইকেল ভেঙেছো—তারপর আবার ভাড়া বাকি রাখতে চাও? ওটি হচ্ছে না। ফেল পয়সা—

কোথায় পয়সা! এখন সবচেয়ে আগে নৃপেনের হাঁটুতে কনুইয়ে ওষুধ লাগানো দরকার। সবারই বাড়ি ফেরাও দরকার। অনেকক্ষণ হল সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাঁচোয়া এই যে—আজ ছিল স্পোর্টস।

আসফাকুল এসে পড়ায় ভাড়া শোধ হল। এমন সময় হায়দার আর পবিত্র এসে দুঃসংবাদ দিল। পিচ রাস্তায় লেখা যায়নি।

আসফাকুল মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলল, আজকের মত যে যার বাড়ি যাই চল। কাল ভোরে হনুমানদাকে টাকা দিতে যাব। তখন একটা বুদ্ধি বেরোবে ঠিক।

পরদিন খুব ভোরে আকাশে চাঁদ থাকতে থাকতে পাঁচজনে গিয়ে হনুমানদার ডেরায় হাজির হল। কোথায় হনুমানদা! ডেরা ফাঁকা কোথায় গেল লোকটা। জামা রয়েছে। স্যাণ্ডেল রয়েছে। এই শেষ রাতে কোথায় যেতে পারে হনুমানদা?

হনুমানদাকে ওরা পাঁচজন এলেবেলে খুঁজতে লাগল। এমন সময় ওপর থেকে দৈববাণী হল। তোমরা বোসো। এখুনি আসছি।

চমকে ওপরে তাকিয়ে দেখে ওরা পাঁচজনই অবাক। হনুমানদা সিঁদুরে আম গাছটার উঁচু ডাল থেকে বুনোলতার পাকানো দড়িতে ঝুল খেয়ে আঁশফল গাছটায় গিয়ে উঠল। তারপর সেখান থেকে তরতর করে নেমে এল। যদি ভুলে যাই। তাই প্র্যাকটিস করছিলাম। কি মনে করে এত ভোরে?

সব শুনে হনুমানদা বলল, কণা কাল সন্ধ্যেবেলা হেসেছিল? ঠিক শুনেছো।

হ্যাঁ। হনুমানদা।

টগরের হাসি নয় তো?

দু'জনেই একসঙ্গে হেসেছে।

তাহলে ঠিক আছে। কোন ভয় নেই। হাসলেই হল। ভাল কথা, আমার টাকা এনেছো। আসফাকুল সাতটা টাকা এগিয়ে দিতেই হনুমানদা গুণে গুণে কোমরে গুঁজে ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলল, এখন ধৈর্য ধরে এগিয়ে যেতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

কিন্তু নৃপেনের যা অবস্থা হনুমানদা—

কি অবস্থা?

নৃপেন নিজেই বলল, দেখার ইচ্ছে হয় কণাকে। আবার দেখলেই বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করে।

তাহলে বেশী দেখা ভাল নয়। তীর্থের কাকের মত বাড়ির সামনে—মোড়ের মাথায় বসে থাকতে দেখলে কদর কমে যাবে। হেডমাস্টার কি ভাববেন। ফিউচার জামাই বকের মত বসে আছে সব সময়। সে ভাল না। তার চেয়ে এক কাজ কর নৃপেন। গল্পের বই পড়তে দে কণাকে। তার ভেতরে তোর চিঠি গুঁজে দে।

দি আইডিয়া!

নৃপেন আমতা আমতা করে বলল, কিন্তু চিঠি?

লিখবি তুই।

তাহলেই হয়েছে। তুমিই চিঠিটা লিখে দাও না হনুমানদা।

কাগজ কলম নিয়ে আয়, লিখে দিচ্ছি। বেনেখামারে সনতদের বাড়ি থেকে কাগজ কলম চেয়ে নিয়ে এল আসফাকুল। আধঘণ্টার ভেতর।

হনুমানদা ছোট জলচৌকির উপর খাতা রেখে লিখতে শুরু করল। রোদ উঠেছে। দুটো ঘুঘুপাখি হনুমানদার ডেরায় রোজকার

মত ভাত খেতে এসেছে তারা পণ্ডিত স্যারের মত এদিক ওদিক মাথা নেড়ে দিব্যি হাঁটছিল।

প্রথম প্যারাগ্রাফ তৈরী হয়ে যেতে হনুমানদা পড়ে শোনাল।

কণা। তুমি কি আমায় চেনো? কে বল তো আমি? সব সময় তোমার সামনে সামনে থাকি। ঝড়জলে বিপদে আপদে আমিই তোমাকে রক্ষা করিব। কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি কাহাকে বাসো? তাহা আমি জানি না। আমার জানিবার ইচ্ছা নাই।

সাইকেলের কথাটা লিখে দাও হনুমানদা।

না। ওসব লিখতে নেই। তাহলে চিনে ফেলবে।

চিনুক না।

ধীরে। ভাই ধীরে। এসব তাড়াহুড়োর জিনিস নয়। রহস্যের ভেতর দিয়ে একটু একটু করে নিজের মুখোশ খুলে ফেলবে নৃপেন। ততদিনে নৃপেনের লাভে পড়ে কণা একদম হাবুডুবু খাবে। হনুমানদা আবার লিখতে শুরু করল। লিখে পড়ে শোনাল।

যখনই বিপদ—জানিবে আমি তোমার কাছেই আছি। কোন শত্রু তোমার কিছু করিতে পারিবে না। যতদিন আমি এই পৃথিবীতে আছি—তুমি নিশ্চিন্তে যদৃচ্ছা যাইতে পার। শুধু মনে রাখিও—আমি তোমার। তুমি কি আমার হইতে পার না।

ইতি—

তোমারই—

হনুমানদা বলল, এই জায়গাটা ফাঁকা রাখতে হবে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। যদি দেখা যায়—মেয়েটা তার বাবাকে সব বলে দিচ্ছে না—শুধু তখনই সুযোগমত নৃপেন তার নাম প্রকাশ করবে। নয়ত নয়। অসময়ে কিছু ঘটলে কেলেঙ্কারি। তেমন লোক হলে পিঠের ছাল তুলে নিতে পারে।

যেমন কথা তেমন কাজ। টিফিনে স্কুল লাইব্রেরীর বই পেল

নৃপেন। ছবিতে বোঝাই। এসকিমোদের দেশের গল্প। পাতার পর পাতা শাদা বরফের ছবি। তার ভেতর চিঠিখানা গুঁজে নিয়ে হেডস্যারের বাড়ির পাশ দিয়ে হাঁটলো তিনবার। শেষবারে কণা জানালার ধারে আসতেই নৃপেন ফিক করে হাসলো। স্কুলে যাওনি ?

কণা কোনো জবাব দিচ্ছে না দেখে নৃপেন সাহস করে এগিয়ে গেল। আমার নারকেলমালায় ঢিল রেখেছিলে কেন ?

মুশকিল আসান! মুশকিল আসান!! বলে অমন হেঁড়ে গলায় চেঁচাচ্ছিলি তাই—

ছিঃ! তুই বলতে নেই এখন।

ওমা! কেন ? আমি তো এক ক্লাস ওপরে পড়ি। ওটা কি বই রে—

গল্পের বই নেবে ? ভাল ভাল ছবি আছে!

দেখি।

বইখানা হাতে তুলে দিয়েই নৃপেন কেটে পড়ল। কণা তখন পাতা উল্‌টে উল্‌টে দেখছিল। মাথা নামানো নৃপেন ছুটতে ছুটতে ডাকবাংলোর মোড়ে পৌঁছে গেল। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস হচ্ছিল। এই সময় কি কেউ তুই বলে ? ঘটে যদি একটুও বুদ্ধি থাকে কণার।

সেদিন সন্ধ্যারাতে অচিন্ত্যকে নিয়ে নৃপেন একটা ফন্দি আঁটলো। ভূগোলের জি এন মণ্ডলকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছিল না। ষ্ট্যাণ্ড আপ অন দি. বেঞ্চ—একদম মুখের বুলি হয়ে গেছে স্যারের। দ্রাঘিমাংশ, লঘিমাংশ ঠোঁটাগ্রে না থাকলে এলোপাথাড়ি ধোলাই।

নীলাম থেকে দুটো গ্যাসমুখোশ কেনা ছিল নৃপেনের। আড়াই টাকায়।

সে-দুটো ধুয়ে সাফ করে নিল ভৈরবের জলে। রাত এগারোটা হবে।

হসটেলের সব আলো নিভে গেছে। চারদিক নিঃঝুম।

ব্লেক আর স্মিথ—দু'জনে মুখোশ পরে নিল। নৃপেনের অর্ডার : স্যারের মশারি তুলে ঘুম ভাঙিয়ে বলতে হবে হ্যাণ্ডস্ আপ। তারপর তারই চোখের সামনে টেবিল থেকে সোনালি রঙের নস্যির কৌটোটা তুলে নিতে হবে। ব্যাস্। বাছাধন তাহলে একটু সাবধান হবে। ক্লাসে অমন রোখা স্বভাবটা একটু নরম হবে।

গরম বলে স্যার দরজা খুলে শুয়ে ছিলেন। জানলায় চাঁদের আলো। নদীর বাতাসে মশারি কেঁপে উঠছে। আবছা অন্ধকারে টেবিলের ওপর নস্যির কৌটোটা জ্বলজ্বল করছিল্। দু'জনের হাতেই সাড়ে ছ'আনার পিস্তল।

অচিন্ত্য মশারি তুলে ধাক্কা দিয়ে স্যারকে জাগিয়ে দিল।

জি এন মণ্ডল আচমকা ঘুম ভেঙে উঠে বসেই দেখে সামনে অন্ধকারে দুটো মাথা। নাকের জায়গায় লম্বা শুঁড়। গ্যাসমুখোশের যেমন থাকে। বাবাগো! বলেই স্যার আবার শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল। নৃপেন শুতে দিল না। হ্যাণ্ডস্ আপ!

স্যার শুয়ে শুয়েই মাথার ওপর দু'খানা হাত তুলে দিল।

অর্ডার মত অচিন্ত্য টেবিলের কাছে গিয়ে নস্যির কৌটোটা তুলে নিল। ইয়েস বস্।

তারপর গোপীস্যারকে সেই অবস্থায় রেখে দু'জনে দুড়দাড় করে ছুটে বেরিয়ে পড়ল। স্কুলের মাঠ জ্যোৎস্নায় ফটফট করছিল। তার ভেতর দিয়ে দু'জনে দৌড়তে লাগল। হেডস্যারের বাড়ির দিককার গোলপোস্টে এসে থামল ওরা। অচিন্ত্য সোনালি নস্যির কৌটোটা আকাশে ছুঁড়ে দিল। নৃপেন ছুটে গিয়ে ক্যাচ লুফে নিল। এবার নৃপেন ছুঁড়ে দিল। আকাশে উঠেই সেটা জ্যোৎস্নার ভেতর চিকচিক করছিল। অচিন্ত্য ছুটে গিয়ে ক্যাচ লুফে নিল। তখনো দু'জনের মুখেই গ্যাস মুখোশ লাগানো। পকেটে পিস্তল। রাত সাড়ে এগারোটা হবে। জেলখানা থেকে একটা ছোট ঘণ্টা পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন দাঁড়িয়ে পড়ল। এত সুন্দর বাতাস। এত সুন্দর আলো। ওরা মুখোশ খুলে ফেলল। নৃপেন বলল, কণা কি করছে বল তো?

ঘুমোচ্ছে।

উঁহু। আমার চিঠি পড়ছে। ওই যে আলো জ্বলছে ঘরে।

হেডস্যার বোধহয় খাতা দেখছেন টারমিনালের।

উঁহু। কণা জেগে জেগে আমার চিঠির উত্তর লিখছে।

চল তবে দেখে আসি।

দু'জনে হেডস্যারের বাড়ির কোণের ঘরটার জানলায় গিয়ে একদম চাবুক খেয়ে ফিরে এল। টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে স্যার যেন কি পড়ছেন। কিংবা খাতা দেখতেও পারেন। অচিন্ত্য বলল, কাল কিন্তু ভূগোল পরীক্ষার খাতা বেরোবে।

ভূগোলের খাতা বেরিয়েছে। জি এন মণ্ডল রোল ডেকে ডেকে খাতা দিচ্ছেন। সেভেনটিন, এইট্টিন, নাইন্টিন, টোয়েন্টি। ফট্টিতে এসে একটু থেমে খাতা দিলেন জগন্নাথকে। তারপরেই ডাকলেন— ফট্টিটু।

কে যেন বলল, ফট্টিওয়ান স্যার?

শেষে ডাকব।

সবাই জানে ফট্টিওয়ান কে। আসফাকুল। তার কিন্তু কোনো চিন্তা নেই। সে ক্লাশের জানালা দিয়ে ধোপাদের খচ্চরটাকে দেখছিল। দুপুরের রোদ পড়ে খচ্চরটার পিঠটা চিকচিক করছে। এত স্লিপারি। একবার লাফিয়ে উঠতে গিয়ে আসফাকুল পিছলে একদম মাটিতেপড়ে গিয়েছিল। এই খচ্চরটাই সারা পাড়ার ময়লা কাপড়ের বোঝা পিঠে চাপিয়ে দিব্যি বেনেখামারের ধোপার মাঠে চলে যায়।

অবশেষে ফট্টিওয়ান এল। স্যার ডাকলেন—আস্ফাকুল এদিকে এসো।

আস্ফাকুল এতদিন বলে এসেছে—সুদিন আসছে। এবার ভালো সময় আসার পালা। এই বুঝি ভালো সময় আসার সময় হলো। স্যারের চোখ দু'টো লাল। নৃপেন ভালো করে দেখলো। কাল রাতে এই লোকটাই বিছানায় 'বাবা গো!' বলে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল। হ্যাণ্ডস্ আপ বলতেই হাত তুলেছিল। কিন্তু জি এন মণ্ডলের রোখামি ভাব তো একটুও যায় নি। বেড়েছে বরং।

আফ্রিকার নদীগুলোকে বঙ্গোপসাগরে এনে ফেললে কি করে?

আসসফাকুল কোনো জবাব দিল না। গোঁত্তা খেয়ে দাঁড়িয়েই থাকল।

সব নদীর উৎপত্তি কিলিম্যানজেরো পাহাড়ে? সাহারার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত? আর পড়ল গিয়ে বঙ্গোপসাগরে? তা কি করে হয় আসফাকুল? বলেই স্যার আসফাকুলের জামা খুলে নিয়ে প্রায় দু'মিনিট ধরে তার পিঠে দু'হাতে ঢোল বাজালেন। ভৌগোলিক হয়েছেন! বলে তবে স্যার থামলেন।

আসফাকুল এতক্ষণ হায়দারের টেকনিক নিয়ে ছিল। দম বন্ধ করে—পিঠ শক্ত করে মার ঠেকিয়েছে। গায়ে লাগেনি। মানে ব্যথা বিশেষ লাগেনি। বরং স্যার বোধহয় হাতে ব্যথা পেয়েছেন। নয়ত এত তাড়াতাড়ি কি থামবার পাত্র!

এবারে আসফাকুল সোজা দাঁড়িয়ে বলল, একসঙ্গে বাইশ পাতা পরীক্ষায় দিলেন তা কি করব? অত মুখস্ত থাকে কারো?

জি এন মণ্ডল ছুটে আসফাকুলকে ধরতে এলেই সে সঙ্গে সঙ্গে সামনের দরজা দিয়ে সটকে পড়ল। স্যার বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখলেন, আসফাকুল স্কুলের মাঠ দিয়ে ছুটছে। স্যার ক্লাশে ফিরে এলেন। সারাটা ক্লাশ চুপ।

আসফাকুল স্কুল কম্পাউণ্ড পেরিয়ে আমবাগানে ঢুকেই দেখে ধোপাদের সেই খচ্চরটা ঘাস খাচ্ছে। একলাফে তার পিঠে চড়ে

বসল আসফাকুল। দু'হাতে শক্ত করে ঘাড়ের ঝুঁটি ধরে নিল'
খচ্চরটা তখন দুলকি চালে ছুটছে। আমবাগান' রূপসার গায়ে
লবনচোরার মাঠে শ্মশানে মড়া পুড়ছে, বি দে রোড, টুটপাড়া—সব
একে একে পার হয়ে গেল ঘোড়াটা। আসফাকুলের মনে হচ্ছিল—
সে সত্যি বুঝি ভৌগোলিক হয়ে যাচ্ছে। কত অল্প সময়ে কত জায়গা
পার হয়ে গেল। বেশ তো? এতক্ষণে খচ্চরেরর পিঠে আসফাকুল
বেশ সযুত হয়ে বসতে পেরেছে। এবারে সে ঘোড়ার পেটে দু'পায়ে
খোঁচা দিয়ে খালিশপুরের পথ ধরল। একটু পরেই ভৈরবের বুকে
পাল তোলা নৌকো, রুজভেল্ট জেটি, শিবমন্দিরের মাথায় জোড়া
অশ্বত্থ চারা—সবই দেখতে পেল আসফাকুল। আজ তার মনে
বাতাস চিরে আনন্দ ঢুকে যাচ্ছে। ঘোড়াটা কি সুন্দর লাফিয়ে
লাফিয়ে ছুটছে। এক সেকেণ্ডে একটা গর্ত টপকে পার হয়ে গেল।
দুপুর বেলা। শহরে সবাই ঘুমোচ্ছে। রাস্তায় একটা লোক নেই।
থাকলে দেখতে পেত—ঘোড়ার পিঠে একজন ভৌগোলিক যাচ্ছে।
এখানকার নদী, কাঠ—সারা ভূগোল তার মুখস্থ।

নদী, মাঠ, রাস্তা নিয়ে ভূগোল।

যে তা চেনে জানে—সে হল গিয়ে ভৌগোলিক।

তাহলে আমি হলাম গিয়ে আসফাকুল ভৌগোলিক।

মনে মনে নিজের নামটা শুধরে নিল আসফাকুল। সরি!
মহম্মদ আসফাকুল ভৌগোলিক। বেঁটে খচ্চরের পিঠে বসে সে প্রায়
তিন মাইল পথ কাবার করে ফেলেছে। সামনেই খালিশপুরের
জঙ্গল। হনুমানদা দেখলে অবাক হয়ে যাবে। ঘোড়া ছুটছে আর
গায়ে বাতাস লাগছে। সামনের মাঠটা দুলছে। কুমুদ স্যারের
বাবা এখন হয়ত বাড়ির পেছনের ছাইগাদা থেকে ছাই কুড়োচ্ছে।

এস এস মাগুরা স্টিমারের ডেকে মাংস রান্নার গন্ধ। সারেং
মহবুবদা দোতলায় ডেকে দাঁড়িয়ে সরবৎ খাচ্ছে। স্টিমার এখুনি
ভৈরবের তীরে এসে ভিড়বে। তখন নোঙর নামিয়ে দেওয়া
হবে জলে। বয়লারে কয়লা দেওয়া থামবে না।

মহবুবদা বলেছিল, বয়লারের খোরাকি কয়লা দিয়ে যেতেই হবে। সব সময়। জাহাজ চলুক বা থেমে থাকুক—খোরাকি দিয়ে যেতেই হবে। বয়লারে ইস্টিম দিয়ে রাখতেই হবে। না হলে জাহাজ একদম ঠাণ্ডা। কোথায় যে কখন দাঁড়িয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। তখন ভরসা বাতাস। নয়ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাক।

ঠিক করাই আছে—এবারই অ্যানুয়েল পরীক্ষায় হনুমানদা ধাতুরূপ সাপ্লাই দেবে। সেই মানুষটা ও কি করছে? খচ্চরের পিঠে বসেই আসফাকুল হনুমানদাকে দেখতে পেল।

হনুমানদা তখন শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। মাথা তুলে সামনেই বেঁটে খচ্চরের পিঠে আসফাকুলকে দেখে হেসে ফেলল, কোথায় পেলি ?

ধোপাদের। তুমি কি করছো ?

বুনো আলু আছে মাটির নিচে। ঠিক এখানটায়। খুঁড়লেই পাওয়া যাবে।

আসফাকুল নেমে দাঁড়াতেই ঘোড়াটা সটকে পড়ছিল। হনুমানদা ছিটকে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই ঘোড়ার পিঠে। আসফাকুল তো অবাক। এ যেন ম্যাজিক। চোখের পলকে হনুমানদা যে কত কি করে ফেলতে পারে—না দেখলে বিশ্বাস হবে না কারো। খচ্চরটার কেশর না ধরেই হনুমানদা একদম ছবির বিবেকানন্দর মত বাবু হয়ে বসেছে—দেখলে মনে হবে—হনুমানদা এখুনি বলে উঠতে পারে—হে ভারত! ভুলিও না—

সেই অবস্থাতেই হনুমানদা ধোপার জন্তুটাকে আগুপিছু করাতে লাগল। যেন কতদিনের পোষা জীব। একবার ডাইনে যায়—একবার বাঁয়ে। অবলীলায়।

সারকাসে ঢুকে প্রথম তিন বছর তো ঘোড়ার খেলা শিখতেই কেটে গেল। শেষের দিকে তো আমি ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে থাকতাম। সে-রকম সার্কাস কি আর জীবনে হবে—

খুব বড় দল ছিল হনুমানদা ?

খুব বড় না। খুব ছোটও না! ঘোড়া ছাড়াও বাঘ ছিল। বাঘটা বড় ভাল ছিল রে! আমাকে খুব চিনতো। চাঁদপাড়ায় তাঁবু পড়ল। প্রথমে তিনদিন এক টাকার গ্যালারি ফুল। তারপরই নাগাড়ে বৃষ্টি। সে আর থামে না। রামছাগলগুলোর হাঁপানি ছিল আগে থেকেই। তা আরও বেড়ে গেল। ঘোড়াদের বাতব্যাধি যে এত বিতিকিচ্ছিরি তা আগে কোনোদিন জানতাম না। সেই টের পেলাম—

বাঘটা তোমায় খুব চিনতো ?

চিনতো মানে ? রীতিমতো ভালবাসতো। শীতকালে ওর আবার শ্লেষ্মার ধাত ছিল। ছোট বালতির এক বালতি চা খাইয়ে দিয়েছি আদার রস দিয়ে—ভোরের দিকে। তবে না হাত পা নেড়ে উঠে বসতো।

কামড়াতে আসতো না ?

সে রেগে গেলে আলাদা কথা। নয়ত আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। ছোট ভাই বলতে পারিস। মালিকের জন্যে খাসির মাংস রাঁধতাম ডেইলি। ওর খাঁচার পাশেই বড় উনুনে রান্না বসাতাম। নিজে চেখেছি। কষা রান্না ওকেও দিতাম। গোলমরিচের ঝাল বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেত। বাঘ জানিস তো—খুব জিদি জীব। গো চাপলে তা করবেই।

আসফাকুল তাকিয়ে আছে দেখে হনুমানদা বলল, সুন্দরবনে আগে তো খুব সার্কাস দল নিয়ে যেতাম। নদীনালায় ভর্তি চারদিক। জ্যোৎস্নার রাতে দেখি কি—এক ব্যাটা বাঘ নদী সাঁতরে ওপারে যেতে চাইছে—আর বারবার মাঝনদী থেকে পাড়ে ফিরে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কি ? অনেক পরে বুঝলাম—স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতরাতে গিয়ে বাঘবাবুর লাইন বেঁকে যাচ্ছিল। তাই তিনি বারবার তীরে ফিরে গিয়ে আবার সোজাসুজি সাঁতরাতে

চাইছিলেন। বড় অভিমানী জীব। মান গেল তো জান রাখবে না।

তোমাদের বাঘের নিউমোনিয়া সারালে না কেন?

ওষুধ কেনার পয়সা কোথায় বল? বৃষ্টি কি বৃষ্টি! সার্কাস বন্ধ। জন্তু জানোয়ারের খোরাকি নেই তখন। একটা ছাগল মেরে বাঘকে দিলাম। খেল না। ছাগলটাও গেল। গায়ে কাঁপুনি দিয়ে বাঘের সেকি জ্বর! দু'টাকার হোমোপ্যাথি এনে আমি শেষে হাঁ খুলে গলায় দিয়ে দিলাম। জ্বর পড়তে বিকেলে এক বালতি ডাবের জল। সেটাই ভুল হল আমার। বুক ভর্তি কফ কাশি। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঘড়র ঘড়র আওয়াজ। রাতে ফিরে জ্বর। সেদিন শেষ রাতেই একদম গয়া। একটা হালুম দিলে না পর্যন্ত।

হনুমানদার চোখের জল দেখে আসফাকুলের নিজের কথা আর মনে থাকল না। গোপী স্যার যা পিটিয়েছে একটু আগে তার তুলনা হয় না। অত অল্প সময়ে অত চড় আর কে বসাতে পারে পিঠে। ভাগ্যিস হায়দারের টেকনিকে দম বন্ধ করে পিঠ এগিয়ে দিয়েছিল।

কথা বলতে বলতে হনুমানদা কখন খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে পড়েছে। শাবল হাতে নিয়ে আবার মাটি খুঁড়তে গেল। এদিকটায় বুনো আলু পাওয়া যায়। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তেই হনুমানদা এগোচ্ছিল। সিঁদুরে আমগাছের ছায়ায় পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আসফাকুলও এগিয়ে যাচ্ছিল। এবার সে-ও বসে পড়ল। বেলা দুপুর। খালিশপুরের জঙ্গল এখন নিঃঝুম। পাখিরা গাছের অনেক উঁচু ডালে খেলছে।

বাঘ যেতেই বাকি ছাগলগুলো গেল। গোরাচাঁদ ডেকরেটর রোজ নোটের গোছা নিয়ে এসে বসে থাকত। বাঁশ, খুটি, তাঁবু কেনার পর মেয়ে দু'টোকেও একদিন বর্ষার সন্ধ্যেয় ভাগিয়ে নিয়ে

গেল। এতদিন যা নিয়ে ছিলাম—সব ফুরিয়ে গেল। ভাল কথা—উনুনে দু'টো পাটখড়ি গুঁজে দে তো।

আসফাকুল পাটকাঠি আগুনের ভেতর দিয়ে আঁচ বাড়িয়ে দিল, কি চাপিয়েছ হনুমান দা?

ঘুম থেকে উঠে একটা খরগোস মারলাম। একদম ঘরের দুয়োরে এসে ঘাস খাচ্ছিল। এত নরম। লাল ঠোঁট। শাদা গোঁফ। একবার মায়া হয়েছিল। তারপর ভাবলাম—কি হবে মায়া করে—ও তো একদিন মরবেই। তখন হাতের দা-খানা ছুঁড়ে দিলাম। কী নিরিখ বল্ হাতের!

আমি তোমার এখানে আজ ভাত খাব হনুমানদা।

কেন? দুপুরে খাসনি?

খেয়েছিলাম। কি ভেবে আসফাকুল বলল, এত মার খেলাম ভূগোল স্যারের হাতে—সব হজম।

মোটামত একটা বুনো আলু তুলে হনুমানদা উঠে দাঁড়াল। একটু পড়াশুনো করলে পারিস। পড়াশুনো তো সবচেয়ে সোজা জিনিস।

সোজা কে বলল তোমায়? জানো—একদিনে বাইশ পৃষ্ঠা মুখস্থ চেয়েছিল। কেউ পারে?

বাইশ না পারিস—দু'পৃষ্ঠা তো পারতিস।

জি এন মণ্ডলকে তো দেখোনি। যা কথা বলে—সব গায়ে কেটে কেটে বসবে। কেমন পর-পর ভাবে আমাদের। কোনো মায়া দয়া নেই।

সে কিরকম মাস্টার? তোদর মত ছেলেদের ভালবাসতে পারে না। আহা! বড় দুর্ভাগা!

আসফাকুল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তুমি তো খুব মায়া দেখাচ্ছো আমাদের জন্যে। কিছু করলে কি?

হনুমানদা মাংস নামিয়ে মাটির হাঁড়ির মুখ থেকে সরা সরিয়ে

নিতেই সুন্দর গন্ধ এসে নাকে লাগল দু'জনেরই। 'বেলা দু'টো তিনটে হবে বোধহয়। খালিশপুরের জঙ্গল জুড়ে তখন পাকা বুনো ফলের গন্ধ ছড়াচ্ছিল। বাতাস উঠে মাঝে মাঝেই সেই গন্ধ চারিয়ে দিচ্ছে। ঘন সবুজ পাতি ঘাসের ডগায় ডগায় কালো ডাইপিঁপড়েরা জায়গা বদলাচ্ছে। ওরা উঁচু ডাঙ্গা জায়গা খুঁজতে বেরিয়েছে। মানে, ক'দিনের ভেতরেই বৃষ্টি নেমে নাবি জায়গাগুলো ডুবিয়ে দেবে। আসফাকুল চোখ তুলে দেখল, হনুমানদা তার ঘরের ছাদে দিব্যি খড় চাপিয়েছে। মেঝেতে মাটি কেটে কেটে চাবড়া বসিয়ে প্লেন আর উঁচু করে নিয়েছে। মাটি কাটায় খানিক জায়গা এখন ডোবা মত। বৃষ্টি হলে জল জমে যাবে। তখন আর বাসন-কোসন মাজতে হনুমানদাকে ওই দূরের পাকুড়তলার খালে যেতে হবে না। শুধু চান করতে খালে নামতে হবে।

নে। খেয়ে দেখ তো কেমন হলো। ভাত ফুটিয়ে রেখেছিলাম আগেই।

এক গ্রাস মুখে দিয়ে আসফাকুলের মনে হলো খালিশপুরের জঙ্গলটা কি সুন্দর পৃথিবী! এখানে সবই কত সহজ। জঙ্গলের বাইরেই যে-শহরটা পড়ে আছে—তা কেন এমন সুন্দর হয় না? বা'জান আর আম্মা ক'দিন এসে যদি হনুমানদার কাছে থেকে যেত। তাহলে বুঝতো।

কই? কিছু বললিনে তো। কেমন?

অমৃত হনুমানদা। তুমি এত সুন্দর রাঁধতে শিখলে কি করে?

বাঃ! কি শোতে ক্লাউন সাজতাম। সন্ধ্যের শো-এর পর তো সার্কাসের মালিকের জন্যে আমি রাঁধতে বসতাম। তাঁবুর পেছনে। আকাশের নিচে। যেখানে সার্কাস গেছে সেখানেই এই ব্যবস্থা। গাঁয়ের কুকুররা এসে ভিড় করত। কী মায়া দেখাচ্ছি বললি? তোদের জন্যে মায়া পড়েনি আমার? না হয় তো কবে চলে যেতাম

এখান থেকে। আমায় পেলে যে-কোন সার্কাস লুফে নিত। এমন হাত পুড়িয়ে খেতে হত বল!

মায়া না ছাই! নৃপেনের জন্যে কি করলে তুমি?

কণা কি গাছের ফল? আমি পেড়ে এনে হাতে তুলে দেব? নেপেনকেও এগোতে হবে সাহস করে। কণাকে দেখে চোরা হাসি হাসতে হবে দু'চোখে।

চোখে হাসি? সে কি জিনিস হনুমানদা?

হনুমানদা তখন কচি মাংসের হাড় চিবোচ্ছিল। মুখের গ্রাস ভেতরে পাঠিয়ে বলল, হবে হবে। একদিনে কি সব শেখা যায়? সে যে অনেক সাধনার জিনিস। যাগ্‌গিয়ে! যা বলেছিলাম, তা করেছিস? পিচরাস্তায় বড় করে লিখেছিস—নেপেন + কণা।

এখনো পারিনি হনুমানদা। আজই গিয়ে লিখব।

তাই করে এসো। তারপর কথা।

বেশ।

মিস্ত্রিপাড়ায় বাড়ি হোয়াইট ওয়াশের অনেক তুলি থাকে। বাঁশের ভারা থাকে। মাটির গামলায় শুকনো চুণ জমে ছিল। ওরা পাঁচজনে মাটির একটা বড় গামলা আর দুটো তুলি সরালো। তুলি মানে মোটা কঞ্চির ডগায় খানিক করে ন্যাকড়া প্যাঁচানো। তাই সই। গামলার শক্ত চুণে দু'বালতি জল ঢেলে ভালো করে গুলে নিল আসফাকুল। তারপর হনুমানদার ডিরেকশন মত কাজ।

পিচরাস্তায় ঠিক হেডস্যারের বাড়ির সামনে বড় করে 'নৃ' লিখতে লিখতে আসফাকুল নৃপেনকে বলল, কণার দিকে তাকিয়ে চোখে হাসতে পারবি তো?

রাত এগারোটা হবে। চোখে হাসি? সে কি জিনিস?

আসফাকুল পিচরাস্তায় মোটা করে তুলি বুলোতে বুলোতে বলল ওই তো মজা! আজ আমি হনুমানদার কাছে শিখেছি। ধর তুই

কাউকে ভালবাসিস। মানে লাভ করিস। কি করবি? তার দিকে সোজাসুজি তাকাবিনে। শুধু কোণাকুণি তাকিয়ে নিয়েই অন্যমনস্ক হয়ে হাসবি। তার নাম চোখে হাসি।

যার জন্যে হাসি—সে যদি বুঝতে না পারে?

পবিত্র চুনের গামলায় জল ঢালতে ঢালতে বলল, অন্যদিকে তাকিয়ে হা-হাসলে য-য-যদি লক্ষ্মীট্যারা ভাবে?

ভা-ভাবলে তোকে ট্যারা ভাববে। নৃপেন ট্যারা নয়—কণা তা জানে।

নৃপেন + কণা লিখতে লিখতে রাত বারোটা বেজে গেল। কালো পিচরাস্তায় সাদা চুণে বড় বড় করে লেখা। কারও চোখ এড়াবার উপায় নেই! কণা তো দেখবেই। দেখে কণার মুখখানা কী রকম হবে—তাই মনে মনে ভেবে নিয়ে নৃপেনের মুখে হাসি বেরিয়ে পড়ল। কী একটা বিরাট আনন্দের ব্যাপার হতে চলেছে।

আনন্দের ব্যাপারটা শুরু হ'ল পরদিন সকাল থেকেই। একদম চারদিক থেকে। জমজমাট ভাবে। হেডস্যার ভোরে উঠেই বাড়ির সামনের পিচরাস্তায় ওদের হাতের কাজ দেখলেন। দেখলেন অন্য স্যারেরাও। স্কুলসুদ্ধ ছেলেরা। মর্নিং-স্কুলে যাবার পথে কণাও দেখল। স্কুলফেরৎ কণা বাড়ি আসার মুখে দেখল—নৃপেন রাস্তার পাশে জল পাস করানোর ক্যালভার্টে বসে আছে। হাতে বই। স্কুলের ঘণ্টা পড়তে এখনো দেরি আছে বোধ হয়। একবার তাকালো যেন। তারপরেই চোখ অন্য দিকে। মুখে হাসি। কি ব্যাপার? কণা এগোত এগোতেই ভাবল, ওর সেদিন কার গল্পের বইয়ের ভেতরে গুঁজে দেওয়া চিঠিখানা আজই বাবার হাতে তুলে দেবে।

নৃপেন তখনো চোখে হাসি দিয়ে যাচ্ছিল। জানেও না তাকে নিয়ে চারদিকে কী তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। আর হবি তো হ— আরও একটা বিপদ যেন তার জন্যে ওৎ পেতে বসে ছিল। সে আর কেউ নন্—স্বয়ং গোপী স্যার। জি এন্ মণ্ডল।

কণা নৃপেনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যেভাবে তার দিকে তাকালো—তাতে খটকা লাগল নৃপেনের। মুখের ভাবখানা তো ভাল নয়। ভ্রূ কোঁচকানো। একদম মারকুট্টে ভাব। নৃপেন তবু চোখে হাসির ভাবটা বজায় রাখল। কণা নিশ্চয়ই সেদিনকার চিঠিখানা পড়েছে।

নৃপেন কিছু জানিনা ভাবটা মুখে ফুটিয়ে স্কুলে ঢুকলো। তখনো ক্লাস বসতে কিছু দেরি। টিচার্স রুমের পাশে বাজারের নীলামদার দু'জন বসে। ওদের কাছ থেকেই নৃপেন আর অচিন্ত্য একজোড়া গ্যাস মুখোশ কিনেছিল। এখানে কি করছে লোকদু'টো? হয়ত পরীক্ষার পুরানো খাতা মণ দরে কিনতে এসেছে। স্কুল থেকে সারা বছর অনেক জিনিস বিক্রি হয়।

ক্লাসে ঢুকতে সবাই তার দিকে তাকালো। কেউ হাসছে। কেউ গম্ভীর। আসফাকুল বলেছে, কী হয় বলা তো যায় না। তাই মরে গেলেও বলা যাবে না—কারা পিচরাস্তায় লিখেছে।

তখনো প্রেয়ারের ঘণ্টা বাজে নি: বাজলে সবাইকে মাঠে যেতে হবে। তখন হেডস্যার সোজা তাঁর কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে অ্যাসেমব্লিতে আসবেন। সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিনের বাণী দেবেন। আরপর লাইন দিয়ে যে যার ক্লাসে যাবে।

প্রেয়ারের আগেই সবাই বলাবলি করছিল: নৃপেন+কণা।

ওদিকে স্কুল থেকে ফিরেই বাবার ঘরে ডাক পড়ল কণার। সে বড় একটা ওঘর মাড়ায় না।

হেডস্যার সোজাসুজি পা ঢোকাচ্ছিলেন বুটে। মুখখানা তাঁর চিন্তিত। অনেক কিছু ভাবতে হচ্ছে একসঙ্গে। কাল জগ্রাফির টিচার জি এন মণ্ডল এক নতুন খবর দিয়ে গেছেন। ক'দিন আগে মধ্যরাতে দু'জন হাফপ্যান্ট পরা ছেলে তাঁর ঘরে ঢুকেছিল। মুখে গ্যাসমুখোশ। হাতে পিস্তল। যাবার সময় নস্যির কৌটাটা নিয়ে গেছে। গোপীনাথবাবু বাজারে ঘুরে গ্যাস মুখোশের নীলামদারদের

সন্ধান পেয়েছেন। আজ তাদের স্কুলে নিয়ে আসবেন। তারা যদি চিনতে পারে—স্কুলের কোন্ ছেলেরা তাদের দোকান থেকে গ্যাস মুখোশ কিনেছিল? এটা একটা ডিসিপ্লিনের কোশ্চেন। প্রেয়ারের সময় নীলামদার দু'জন প্রত্যেক স্টুডেন্টকে ভাল করে দেখবে।

তার ওপর আবার পিচরাস্তায় লেখালেখি!

এ এক বিষম কাণ্ড। নৃপেনকে আজ ডাকবেন, ঠিক করলেন মনে মনে।

বুটের ফিতে বেঁধে দেবেশ্বরবাবু দেখলেন, তাঁর মেয়ে কণা দাঁড়িয়ে।

তুমি নৃপেনকে চেনো?

তেমন চিনি না। একদিন একখানা গল্পের বই দিয়েছিল।

কি বই দেখি?

কণা বইখানা এনে বাবার হাতে তুলে দিল। ইচ্ছে করেই চিঠিখানা বইয়ের ভেতর থেকে সরালো না। বাবা দেখুক কত বড় আস্পর্ধা!

হেডস্যার পাতা ওলটাতে ওলটাতে বইখানার ভেতর ভাঁজকরা সাদা কাগজ দেখে খুলে পড়লেন। পড়তে পড়তে মুখখানা লাল হয়ে গেল।

তুমি পড়েছো?

বাবার লাল মুখ দেখেই কণার ভয় হয়ে গেল। কি পড়েছে? বইখানা? না, চিঠি? আন্দাজে, দু'দিকই বোঝায় এমনভাবে বলল, না বাবা। উইকলি পরীক্ষা চলছে। গল্পের বই পড়ার সময় কোথায়!

দেবেশ্বরবাবু শব্দ করে বইখানা বন্ধ করলেন। তারপর মস্ মস্ করে হেঁটে স্কুল কম্পাউণ্ডে গিয়ে পড়লেন। হাতে সেই বই। এসকিমোদের গল্প। লাইনে দাঁড়িয়েই নৃপেন উসখুস করতে লাগল। রেড, ব্লু, ইয়েলো, গ্রীন—চার হাউসে ভাগ হয়ে সারাটা স্কুলের

ছাত্ররা লাইন করে দাঁড়িয়ে। তার ভেতরে দাঁড়ানো নৃপেনের উসখসানি আর থামে না। ও বইখানা হেডস্যারের হাতে—এখন কেন ?

তবে কি - তবে কি কণা বিট্রে করে দিল ? আজ দিনটাই বড় সুন্দর শুরু হয়েছিল ! এই খানিক আগে কণাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কেমন নতুন শেখা চোখে হাসি হাসতে হয়েছে তার। অন্যমনস্ক হয়ে—অন্যদিকে তাকিয়ে।

আর আধঘণ্টা না যেতেই—

দিনের বাণী শেষ করলেন হেডস্যার। অমনি কোত্থেকে গোপীস্যার বাজারের সেই নীলামাদার দু'জনকে নিয়ে একদম লাইনের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

তখন হেডস্যার বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা গ্যাসমুখোশ কিনেছো লাইন থেকে বেরিয়ে এসো।

কে কে কিনেছে—অনেকেই তা জানে। নতুন কেনার পর স্কুলে এনেছিল নৃপেন। অচিন্ত্যর হাত থেকে কেউ কেউ নিয়ে মুখেও পরে দেখেছে। অনেকটা হাতির শুঁড়ের মত একটা নল নেমে আসে মুখে।

হেড স্যার আবার বললেন, যে যে গ্যাসমুখোশ কিনেছো বেরিয়ে এস লাইন থেকে। পাপের বেতন শাস্তি। শাস্তির পর আবার আরাম।

অনেকেই ঘুরে ঘুরে অচিন্ত্য আর নৃপেনকে দেখছিল।

পবিত্র, আসফাকুল, হায়দার—সব জানে। তারা তো যে যার লাইনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখে সিগন্যাল দিতে লাগল। কথা বলার উপায় নেই। অচিন্ত্য আর নৃপেন নির্বিকার মুখে দাঁড়ানো।

গোপীস্যার তখন দুজন নীলামদারকে নিয়ে লাইনের ভেতর ঢুকে পড়লেন। নীলামদাররা এক একজনের মুখ দেখে—আর একটু একটু করে এগোয়। অচিন্ত্যর কাছে এসে একজন দাঁড়িয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে গোপীস্যারও দাঁড়িয়ে গেলেন। লম্বা মত নীলামদারটা অচিন্ত্যকে দেখে বলল চেনা চেনা লাগে। কি বাবু চিনতি পারো? দশ পয়সা বাকি রেখে মুখোশ কিনে নে গেলে দু'বন্দুতে—

অচিন্ত্য আর কিছু বলার ফুরসুৎ পেল না। গোপীস্যার ঘাড় ধরে লাইনের বাইরে টেনে আনলেন' আরেকজন কে ছিল? বল্ এক্ষুণি।

এই সময় নৃপেন যা করল তা কেউ ভাবতেও পারেনি। ওকে মারবেন না স্যার। আমিই দায়ী। আমার কথায় কিনেছিল ও। ওর কোনো দোষ নেই। আমিই দায়ী।

অচিন্ত্যকে ছেড়ে দিয়ে নৃপেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন গোপী-স্যার। তবে তুমিই হলে পালের গোদা!

মারছেন কেন স্যার?

মারবে না! আদর করবে?

মারছেন কেন স্যার? কি করেছি অমন?

হেডস্যার 'ডিসপার্স!' বলে সবাইকে ক্লাশে যেতে বললেন। অচিন্ত্যকেও। শুধু, নৃপেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, টিচার্স রুমে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে। বলেই হেডস্যার কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা টিচার্স রুমে চলে গেলেন।

থতমত খেয়ে গোপীস্যারও ছাত্রদের পিছু পিছু ক্লাশে চললেন। নীলামদার দু'জন তখনো দাঁড়িয়ে।

আসফাকুল, অচিন্ত্য, পবিত্রর নৃপেনকে একা ফেলে ক্লাসে যাবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু উপায় কি। হেডস্যারের অর্ডার। মানতেই হবে।

ক্লাসে গিয়েও কারও মনে স্বস্তি নেই। শুধু ওরা চারজনই নয় —সারাটা স্কুলই যেন অস্বস্তিতে ভুগছিলো। মাস্টারমশাইরা সুদ্ধ। কত কি হয়ে যাচ্ছে আজ। স্কুলে ঢোকার পথে পিচরাস্তায় সেই লেখা। তারপর গ্যাসমুখোশের দু'জন নীলামদার।

আজকে 'স্কুলে যার অস্বস্তি সবচেয়ে বেশি—তিনি হলেন স্বয়ং, হেডস্যার—দেবেশ্বর মুখার্জি এম এস সি, বি টি, এম আর এস টি (লণ্ডন), ডিপ-ইন-এডিনবরা। গ্যাসমুখোশ তিনি বুঝতে পেরেছেন। পিচরাস্তার লেখা—তাও তিনি বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু নাম নেই, ধাম নেই—বইয়ের ভেতর গুঁজে দেওয়া এই চিঠির লেখকটি কে? নৃপেন নয় নিশ্চয়।

খানিক পরে একে একে অচিন্ত্য, পবিত্র হায়দার, আসফাকুলের ডাক পড়ল হেডস্যারের ঘরে। ঠিক হেডস্যারের ঘর নয়। তাঁর পাশের ঘরে। সে-ঘরে র‍্যাকে থাক থাক ম্যাপ গোটানো থাকে। গ্লোব থাকে। থাকে ফুটবল, ডাস্টার, চকখড়ি, ঝাড়ন আর গোছা গোছা বেত।

ওরা ঢুকতে না ঢুকতেই একটা গোঙানি শুনতে পেল। তারপর নৃপেনের গলা। জানি না স্যার।

বলতেই হবে তোমাকে। কে লিখেছে এই চিঠি।

হেডস্যারের গলা শেষ হতে না হতেই সপাং। সপাং। দু'বার।

আমি জানি না স্যার। ও চিঠি কে লিখেছে আমি জানি না। আপনি শুধু শুধু মারছেন স্যার। ও চিঠির বিন্দুবিসর্গ আমি জানি না স্যার।

তবে পিচরাস্তায় লিখেছে কে?

আমি স্যার।

তুমি একা? অতখানি একা লিখেছো? অত বড় বড় লেখা?

হ্যাঁ স্যার।

এমন সময় আসফাকুল ঘরে ঢুকলো। আমিও লিখেছি স্যার। আমরা লিখেছি স্যার।

এইতো চাই। আমি এই চাইছিলাম। বলতে বলতে হেডস্যার ঘরের মধ্যে ঠিক মাঝখানটায় সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

মেঝে গেছেন। হাতে জোড়া বেত। নৃপেন আস্তে আস্তে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল।

তারপর সোজা দাঁড়িয়ে নৃপেন বলল, না স্যার। আমিই একা ওসব কথা রাস্তায় কাল সারারাত ধরে লিখেছি। মারতে হয় আমাকে একা মারুন। ওদের শুধু শুধু টানছেন কেন?

কেন টানছি এখুনি বুঝতে পারবে। কান টানলে মাথা আসবে। আমি জানতে চাই তোমাদের পেছনে আসলে কে আছে? মাথাটি কার? গ্যাসমুখোশ প'রে মাঝরাতে হ্যাণ্ডস্ আপ! নস্যির কৌটো হাবিশ। তারপর গল্পের বইয়ের ভেতরে গুঁজে আমার মেয়েকে চিঠি। শেষে আমারই বাড়ির সামনে নৃপেন + কণা লেখালেখি। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। মামদোবাজি পেয়েছো?

এবারের 'সপাং' গিয়ে পড়ল আসফাকুলের হাতে। আবার সপাং। আবার।

এবার একদম এলোপাথাড়ি। হেডস্যারের কপালে সিঁথি ভেঙে চুল এলিয়ে পড়ল। তার ভেতর গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম। মেঝেতে দু'টো গ্লোব গড়াগড়ি যাচ্ছে। আসফাকুল গোটানো ম্যাপ তুলে নিয়ে তলোয়ার করেছে। তাই দিয়ে স্যারের বেত ঠেকাচ্ছে।

আর স্যার চেঁচাচ্ছেন, কে আছে তোদের পেছনে? এখনো বল। আমি কিছু বলব না তাকে। কে আছে বল? কার মতলবে এসব করছিস। আমি খবর পেয়েছি, তোরা প্রায়ই খালিশপুরের জঙ্গলে যাস। একবার ঢুকলে আর বেরোতে চাস না।

আসফাকুল এবার ঘাবড়ালো। কে বলেছে স্যার।

কে আবার বলবে? ঘোড়া!

ঘোড়া?

হ্যাঁ। ধোপাদের ঘোড়া নিয়ে আমার স্কুল থেকে তোদের কে খালিশপুরের জঙ্গলে গিয়েছিলি? ধোপারা ঘোড়া না পেয়ে খুঁজতে এসেছিল স্কুল কম্পাউণ্ডে। তারপর শেষে খালিশপুরের

জঙ্গলে গিয়ে খুঁজে পেয়েছে। এখনো বল তোদের পেছনে কে আছে। আমি তোদের বাবার মত। কোনো কেপমারি দলের হাতে পড়িসনি তো ?

ঘর্মাক্ত হেডস্যার ঘরের সবেধন চেয়ারখানায় বসে পড়লেন। ডানহাতের বেতজোড়া মেঝেতে খসে পড়ল। আসফাকুল ছুটে গিয়ে বড় গ্লাসে জল ভরে এনে হেডস্যারের মুখের সামনে ধরল।

স্যার একদমে ঢক ঢক করে গ্লাস শেষ করে ঠক করে টেবিলে রাখলেন। তারপর দম নিয়ে বললেন, আমি তোদের ভালবাসি।

হেডস্যার যে এরকম হতে পারেন আজকের আগে ওরা তা কোন দিন ভাবতেও পারে নি। ফুরিয়ে যাওয়া গ্লাসে আবার জল ভরে এনে দিল আসফাকুল। খান স্যার।

এই তো খেলাম। তারপর স্যার আচমকাই বললেন, কতদিন আগে সেভেন এইটে পড়েছি বল তো।

পবিত্র এত দয়ালু হেডস্যার কোনদিন দেখেনি। শোনেওনি। পড়েওনি কোন বইতে। তাড়াতাড়ি স্যারের সঙ্গে বন্ধু বন্ধু ভাবে বলল, তা পঞ্চাশ বছর হবে—

পাগল নাকি ! আমিই তো এখনো পঞ্চাশ পেরোইনি।

সেভেন এইটে কদ্দিন আগে পড়তেন ?

এই তো সেদিন। ঠিক তিরিশ বছর আগে। তোদের আমি জানি। তোদের ব্যাণ্ড পার্টি তো সবচেয়ে ভাল। আমায় একটু বাড়ি পৌঁছে দিবি—

পাঁচজনই একসঙ্গে বলে উঠল, নিশ্চয় স্যার।

শরীরটা ভাল বোধ করছি না।

তখন পুরোদমে স্কুল চলছে। কেউ জানতেও পারল না—শাস্তি পেতে ডেকে নেওয়া ওই পাঁচজনের কাঁধে ভর দিয়েই হেডস্যার বাড়ি চলে গেলেন। ওরাই বসার ঘরে বড় খাটে হেডস্যারকে শুইয়ে দিল।

হেডুর বউ বলল, ক'টা ডাব এনে দেবে বাবা ?

নৃপেন এগিয়ে গেল। ডাব নিয়ে ফেরার পথে আসফাকুল বলল, তোর শ্বশুর পটল তুলবে না তো ?

ওরকম অলুক্ষুনে কথা বলছিস কেন ? এমন কি অসুখ স্যারের ? আমাদের মারতে মারতে হাঁফিয়ে পড়েছিলেন। তারপর মোটার ধাত।

তুই স্যারকে এখন থেকেই বাবা বলে ডাকিস।

তাহলে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আবার প্যাঁদাবে। স্যারের রাগ তো জানিস না। নেহাৎ শরীর খারাপ তাই। নাহলে আরও যে কতক্ষণ পেটাতো কে জানে !

তাতে কি ? তুই তো জামাই। তোর তো বাবা ডাকার হক আছে।

সত্যি বলছিস ? মারবে না ? কিন্তু কণাকে তো একবার দেখলাম না। তোর কথামত চোখে হাসি হাসতে গিয়ে এই কাণ্ড। শেষকালে বাবার হাতে তুলে দিল চিঠিখানা।

বিট্রেয়ার। প্রেমের মর্যাদা জানে না।

নৃপেন বলল, আস্তে আস্তে শিখিয়ে নেব। নৃপেনের কি মনে হল। আসফাকুলকে বলল, আচ্ছা আমরা ভাল হতে পারি না ?

ভাল তো আছিই।

তা বলছি না। যাকে বলে ভালো ছেলে—সেই রকম আর কি।

কি রকম ?

ভালো ছেলে দেখিসনি ? সবাই যাদের প্রশংসা করে। পড়াশুনোয় ফার্স্ট। একদম আদর্শ ছেলে।

তাহলে তো পাঁচজনকেই ব্রাকেটে ফার্স্ট হতে হয়।

ব্রাকেটে দরকার কি। ধর আমি ফার্স্ট হলাম। তুই সেকেণ্ড। এইভাবে আর কি।

তাহলে এতদিন যারা ফার্স্ট সেকেণ্ড হচ্ছিল—তাদের কি হবে ?

আমাদের কথা ভেবে কি তারা একটু পিছিয়ে যাবে না ?

চেষ্টা করে ভাল রেজাল্ট করা যায় কিন্তু যারা এতকাল ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়েছে—তারা কি চেষ্টা করে খারাপ করতে পারে নৃপেন ?

আমাদের মুখ চেয়ে পারবে না ? ধর কণার মুখ চেয়ে—

এর ভেতর কণা আসছে কোত্থেকে ?

মানে আমার মুখ চেয়ে। আমাদের—মানে আমার আর কণার মুখ চেয়ে ? ধর যদি ফার্স্ট হই তাহলে কি হেডস্যার আমাকে জামাই করতে আপত্তি করবেন ?

ওঃ! এই কথা। কিন্তু তার আগে কণার মন জানা দরকার। যে-মেয়ে বাবার হাতে চিঠি তুলে দিয়ে মজা দেখে তাকে বিশ্বাস কি !

ছেলেমানুষ তো বুঝতে পারেনি।

ছেলেমানুষ ? আমাদের চেয়ে এক ক্লাস ওপরে পড়ে না ?

সবার কি সময়মত বুদ্ধি হয়।

হেডুর বউ ছ'টা ডাব নৃপেনের হাত থেকে নিয়ে মেঝেতে রাখল। তারপর বলল, জ্বরটা বেড়েছে। বারবার বলছেন, খালিশপুরের জঙ্গলে যাব। এরকম তো কখনো ভুল বকেন না।

নৃপেন উঁকি দিয়ে দেখল, কণা তার বাবার মাথায় জলপটি দিচ্ছে। একবার ভাবল, এখন এখানে একবার কণার দিকে তাকিয়েই চোখে হাসবে কিনা। কিন্তু গতিক সুবিধের নয় বুঝে ওদিকেই গেল না। কণার মাকে বলল, একবার কবিরাজ মশাইয়ের কাছে যাব ?

অচিন্ত্য হায়দার পবিত্র তো গেল।

আচ্ছা দেখছি বলে নৃপেন আর আসফাকুল বাইরে এল। স্কুল এখনো ছুটি হয়নি। পবিত্র সবার বইখাতা নিয়ে মইত্যার দোকানে রেখেছে। হেডস্যারের এদিকে ধুম জ্বর। শেষে না খালিশপুরের জঙ্গল বরাবর জ্বর গায়ে হাঁটা ধরেন। কিছু বলা যায় না।

হেডস্যারের যা জেদ। শেষকালে ধোপাদের ঘোড়াটাই হনুমানদার হদিশ দিয়ে দিল। হনুমানদা যদি ধরা পড়ে তাহলেই চিত্তির।

অচিন্ত্যর সঙ্গে হায়দার আর পবিত্র আবার কোন্ কবিরাজের কাছে গেল ?

নৃপেন বলল, হয়েছে। বুঝতে পেরেছি। কুমুদ স্যারের কবিরাজ বাবার কাছে গেছে।

সে তো মুক্তাভস্ম বলে পোড়া ঘুঁটের মিহিছাই দেবে।

হিতে বিপরীত হতে পারে।

চিন্তিত নৃপেন আর আসফাকুল জোর পায়ে কুমুদ স্যারের বাড়ির দকে এগোচ্ছিল। এক জায়গায় এসে আসফাকুল দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ পোস্টঅফিসের ছাদে। আবার জোড়া অশ্বত্থ চারা দেখলাম। ভাখ্। ছাদের মাথায় ত্রিশূলের পাশেই। খুব গুড সাইন। এগিয়ে যা। তোর হবে। কণা তোর বশে আসবেই।

বলছিস ?

সিওর ! মিলিয়ে নিস আমার কথা।

কুমুদ স্যারের বাড়ির বারান্দায় চোখে তারে বাঁধা চশমা লাগিয়ে তার কবিরাজ বাবা একখানা টিনের চেয়ারে বসে। হামানদিস্তার ওষুধ বাটা হচ্ছে। অচিন্ত্য, হায়দার, পবিত্র মেঝেতে বসে তাই দেখছে।

ওরা দু'জন কাছে যেতেই অচিন্ত্য ফিস ফিস করে বলল, কুমুদ স্যার টিউশনি থেকে ফেরেননি। স্কুল থেকেই বেরিয়ে গেছেন। সেই ফাঁকে ওষুধটা তৈরি করিয়ে নিচ্ছি।

সিমটম্ বলেছিস ?

হুঁ। রেগে গিয়ে মারপিট। তারপর শরীর অবসন্ন। জলপান। কম্প দিয়ে জ্বর।

বয়স বলেছিস।

পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ। তিরিশ বছর আগে সেভেন এইটে পড়তেন বললেন তো ?

ওষুধের দাম ?

কণা দিয়ে দিয়েছে। কিছু বেঁচে যাবে। তাই দিয়ে আলুর চপ খাব ভাবছি।

না। ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে।

হায়দার বলল, ভালবাসা উথলে উঠেছে ! তাও তো এখনো জামাই হোসনি।

নৃপেন সেকথায় গেল না। বেশ উদ্বিগ্ন স্বরেই বলল, রোগীর নাম বলেছিস ?

পাগল ! তাহলে জানাজানি হয়ে যাবে না ?

জানাজানিতে দোষের কি ছিল ?

নৃপেন, তোর কি মাথার ঠিক নেই ? তাহলে তুই চিকিৎসার চান্স পেতিস ? এরপর ওষুধ দেওয়া নেওয়া নিয়ে কতবার দেখা হবে। চাই কি কণার সঙ্গে একটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয়ে যেতে পারে। অন্যরা এলে এসব পারতিস ? এমন সুযোগ হেলায় হারাবি।

এদিকটা এত ভেবে দেখেনি নৃপেন। আস্তে বলল, তোরা যা ভাল বুঝিস। আমার তো মাথার ঠিক নেই।

আসফাকুল হেসে বলল, গুড সাইন ! আবার জোড়া অশ্বত্থচারা দেখলাম।

নৃপেন বলল, হেডু কিন্তু জ্বরের ঘোরে খালিশপুরের জঙ্গলে যেতে চাইছে।

দাঁড়া না। পাকা হরিতকির সঙ্গে হীরকভস্ম বাটা এখন গিয়ে খাইয়ে দেব। তারপর আর কোথাও যেতে চাইবেন না। শুধু নৃপেন, নৃপেন বলে ডাকতে থাকবেন। চাইকি তোকে তুলে নিয়ে কোলে বসাতে পারেন।

অসুখটা কি স্যারের ?

কবিরাজ মশাই বলছেন, বায়ুর প্রকোপ। লক্ষণ শুনে বললেন, রোগীর নাকি পিত্তির ধাত আছে। রগচটা।

বড় শিশিতে ওষুধ নিয়ে ওরা যখন গেল তখন স্যার খাটের উপর উঠে বসেছেন। আর একদম না থেমে বলে যাচ্ছেন, খালিশপুরের জঙ্গলে নিয়ে চল একবারটি। মোটে একবার। ধোপাদের ঘোড়াটা পথ চেনে।

কণা তার বাবার পিঠে হাত বোলাচ্ছিল। নৃপেনকে দেখেই বলল, ওষুধ পেলি?

হাতের শিশিটা এগিয়ে বলল, পুবমুখী করে খাওয়াতে হবে। ধরে থাক। আমি খাইয়ে দিচ্ছি। পাঁচজনে মিলে স্যারকে অনেক কষ্টে পুবমুখী করল। করা কি যায়! সেই এক কথা মুখে। আমায় একবারটির জন্যে খালিশপুরের জঙ্গলে নিয়ে চল। একবারটি—

নিয়ে যাব স্যার। নিয়ে যাব ঠিক—এসব বলে স্যারকে হাঁ করিয়ে কুমুদ স্যারের কবিরাজ বাবার সেই ওষুধটুকু খাইয়ে দিল। দাগ মেপে খাওয়াবার কথা ছিল। তা আর হল না। কে আর অত বড়মানুষটাকে বার বার পুবমুখী করবে? তাই বড় মাত্রার তিন দাগ ওষুধ একবারেই খাইয়ে দিল। খেয়েই স্যার টগবগ করে এগিয়ে গেলেন। ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পাঁচজনে এসে বারান্দায় বসল। হেডস্যারের বারান্দা। ছুটির দিন বিকেলে এখানে বসে স্যার আলিজান আর মেহের বেয়ারাকে দিয়ে গোটা দশেক গ্লোব সাবানজলে ধোয়াধুয়ি করেন। নয়ত মাঠে মেলে দেওয়া সামিয়ানার রিপু করা দেখেন।

এখন সেখানে সন্ধ্যার প্রথম জ্যোৎস্না। স্কুলসুদ্ধ কেউ এখনো বোধহয় জানে না—হেতু কতটা অসুস্থ। অথচ আজও দুপুর পর্যন্ত এই হেতু ছিল জোড়া বেতের চ্যাম্পিয়ন। এখন ঘুঁটের ছাই মেশানো পাকা হরিতকি বাটা খেয়েই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। নয়ত

যে ভাবে ঠেলে উঠেছিল—তাতে এখুনি হয়ত তাকে খালিশপুরের জঙ্গলে নিয়ে যেতে হত।

ওদের পাঁচজনের ছায়া এসে পড়েছে বারান্দার নীচে। একটা লম্বা টানা জোড়া মেলানো ছায়া। দেখে মনে হবে কোন লম্বা জন্তু পা গুটিয়ে শুয়েছে সবে। সেই ছায়ার ওপর আরেকটা সরু ছায়া এসে পড়ল। ওরা ঘুরে তাকিয়ে দেখে, কণা। একবেলাতেই শুকিয়ে সরু হয়ে গেছে! সেই কখন থেকে জলপট্টি দিচ্ছে স্যারের কপালে। ওদের না হয় স্যার। হাজার হোক ওর তো বাবা।

টেম্পারেচার নেমেছে।

নামবেই। কুমুদ স্যারের কবিরাজ বাবার ওষুধ তো!

রেমিশন হয়ে গেছে। এখন তোরা বাড়ি যা।

এইটিই অপছন্দ হলো ওদের। সারাদিন এত কাণ্ডের পর কণা সবে কাছাকাছি এসেছিল। আর এখুনি? তাছাড়া ওকি? তুই তুই করে কথাবার্তা? এই কি কথার ছিরি! হোক না এক ক্লাশ ওপরে পড়ে। তাই বলে! হজরত মহম্মদের জীবনী র‍্যাপিড রিডিংয়ে পড়েনি? তাঁর স্ত্রী তো কত বড় ছিলেন।

কণা হঠাৎ বলল, খালিশপুরের জঙ্গলে কে থাকেন রে?

সে এক কাপালিক। বলেই অচিন্ত্য জিব কামড়ালো। কিন্তু এখন আর ফেরার পথ নেই।

কেমন কাপালিক?

নাগা কাপালিক। কিন্তু বাঙালীদের মত দেখতে ঠিক। বাংলাও বলে। কপাল দেখে বলে দেবে—এক চান্সে প্রোমোশোন হবে কিনা। শুধু একটা ডাঁশা পেয়ারা হাতে নিয়ে যেতে হবে। এই হল গিয়ে তার দক্ষিণা। ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দেয়।

বাবার শরীরটা কেমন যাবে বলে দেবে?

এবার নৃপেন বলল, একদম কাঁটায় কাঁটায় বলে দেবে। সকালে বলেন। খুব ভোরে—

বেশ তো। কাল আমায় নিয়ে যাবি সকাল সকাল ?

অসুবিধা কিসের ? বলেই আসফাকুল চোখ টিপল নৃপেনকে ! নৃপেন সঙ্গে সঙ্গে চোখে হাসি দিয়ে তাকালো। বারান্দাটা অন্ধকার। তাই কণা কিছুই দেখতে পেল না।

পরদিন সকালেও হেডুর ঘুম ভাঙলো না। নিঃশ্বাসে বুক উঠছিল নামছিল। কণা একখানা তাঁতের শাড়ি পরে বেরিয়ে এল।

নৃপেন গতরাতেই খালিশপুরের জঙ্গলে গিয়ে হনুমানদাকে তৈরি করে এসেছে ! পাখিপড়ার মত সব শিখিয়ে এসেছে। বার বার বলেছে, কোন ভুল করোনা হনুমানদা। মনে রাখবে—কণা আসছে তুমি এক জন নাগা কাপালিক। কিন্তু বাঙালীদের মত দেখতে। কথাও বল বাঙালীদের মত। তবে তাতে একটু নাগা টান থাকবে—

বাংলা কথায় নাগা টান ? সে কি জিনিসরে বাবা ! এ আমি পারব না।

পারতেই হবে হনুমানদা। কতগুলো বাধা পেরিয়ে এসেছি বল। হেডস্যার বলেছেন—তিনি নাকি আমাদের ভালবাসেন। কণা নিজের থেকে বলছে—খালিশপুরের জঙ্গলে আসবে এবার তুমি সব ঠিক করে দাও। ঝাড়ফুঁক মন্ত্র—যা হয়—

ওরে বাবা ! এত আমি পারব না। আমার মুখ দিয়ে বাঙালীর বাংলা বেরিয়ে যাবে কিন্তু।

না না একটু নাগা টান দিয়ে বোলো। এইসব বলে তো নৃপেন রাজি করিয়ে এসেছে হনুমানদাকে। চলে আসার সময় নৃপেনকে হনুমানদা বলে দিয়েছে—সব আমি সামলাবো। কিন্তু সন্ধ্যের আগে দশটি টাকা চাই। এই জঙ্গলে বসে আর মশার কামড় খেতে পারব না।

এখন নৃপেন আর কণা হাঁটতে হাঁটতে নদীর ঘাট, শিববাড়ি পার হয়ে গেল। আর খানিক গেলেই খালিশপুরের জঙ্গল।

শাড়িপরা কণাকে নৃপেনের একদম অন্য রকম লাগছে। গলায়

বোধ হয় রথের মেলা থেকে কেনা মালা। আগে আগে হাঁটছিল। ফিরে বলল, আর কত দূর ?

এইতো এসে গেছি।

তুই ও ভাষা শিখলি কোত্থেকে ?

কোন্ ভাষা ?

চিঠি লিখেছিলি। মনে নেই ?

নৃপেন সোজাসুজি তাকাতে পারছিল না আস্তে বলল, তুমি বলে ডাকলে পারো।

কোন দুঃখে ! তারপর হেসে বলল, কেমন তুলে দিলাম চিঠিখানা বাবার হাতে—

এ বিশ্বাসঘাতকতা করলে কেন কণা ?

আহা ! আমায় বলে লিখেছিলি ? ধরিয়ে দেব না তো কি।

এসব কথা কি কেউ বলতে পারে ?

তাই বুঝি ! লিখতে তো বেশ পারিস।

'তুমি' করে কথা বলতে পার না কণা ?

কেন রে ?

এখন যে আমাদের প্রেম হচ্ছে—

এইভাবে হয় বুঝি ?

একবার কাছে আসেং। কাছে আসেং—

কণা তাড়াতাড়ি মাটিতে ঢিপ করে মাথা ঠুকে একটা প্রণাম করল দূর থেকে। নৃপেনও কম অবাক হয়নি। এ কোন্ হনুমানদা। একদম চেনাই যায় না। ঘরের দেওয়ালে গাছপাতার পাতা দিয়ে বুনো ফুলের তোড়া বসানো এদিকে ওদিকে। উল্টোনো ধামার ওপর একটা শেয়ালের চোয়াল। নিশ্চয় বনবাদাড় থেকে কুড়িয়ে এনেছে। তার ভেতরে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে হনুমানদা। এই ভোরবেলাতেই।

আর নিজে তো সেজেছে আস্ত নাগা কাপালিক। শাবলখানা মাটিতে বসিয়ে দিয়ে দাঁড় করালো। নিজের মুখে, সারাগায়ে হনুমানদা কাঠের পোড়া ছাই মেখেছে। মাথার চুল উল্টো করে ঝুঁটিবাধা। চেনে কার সাধ্য।

হনুমানদা হাত তুলে কাছে ডাকলো আবার! একদম কাছে আসেং—

কণা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল।

বাবার বোখার হয়িং? সারে যাবেন! বলেই হনুমানদা বাঁ হাতে একটা ডুমুর এগিয়ে দিল। কণা ভয়ে ভয়ে হাতে নিল।

হনুমানদা নৃপেনকে দেখিয়ে বলল, এ কৌন্?

কণা থতমত খেয়ে বলল, বন্ধু—

হনুমানদা এরই ভেতর চোখে হাসল। শুধু বন্ধু? না আউর কিছুং?

কণা মাথা নিচু করল। নৃপেনের বুকের ভেতরটা তখন ধড়ফড় করছে। খুব সাবধানে হনুমানদার দিকে তাকিয়ে বলল, সাধুবাবা—আমাদের উপর কোন আদেশ আছে আপনার?

উর পিতাজিকে বাঁচাতে চাইলে আজ বিকেলে দু'জনকে একবার আসতে হবেং—

বাবা বাঁচবে না?

কণাকে অভয় দিল হনুমানদা। কুছু চিন্তা নাহিন্। ..জন আসবি। মন্ত্র দিবং।

কৃতজ্ঞতায় কণার মাথা নুয়ে এল। এই নৃপেনকে সে মার খাইয়েছে? বাবার হাতে চিঠি তুলে দিয়ে? আর সেই কিনা তার বাবাকে বাঁচাতে তাকে খালিশপুরের জঙ্গলে নাগা কাপালিকের ডেরায় নিয়ে এসেছে?

ফেরার পথে কণা বলল, তুই আমায় ভালবাসিস?

নদীর উপর দিয়ে তখন ইলিশের নৌকোরা ফিরছে।

তাতে আর সন্দেহ কি?

একটা অনুরোধ রাখবি?

বল।

আমায় ক্ষমা করে দে। আমার জন্যে অনেক মার খেয়েছিস।

তোমার জন্যে অনেক কষ্ট করতে ইচ্ছে করে কণা। কোন কঠিন কাজ যদি করতে দিতে—

ভাল করে পড়াশুনো করে ফাস্ট' হয়ে যা—ডবল প্রোমোশন পেয়ে আমাকে ছাড়িয়ে যা।

আমাকে 'তুই' না বলে বলে 'তুমি' বলতে পারো না?

কি করে বলি। তুই যে আমার চে নিচু ক্লাসে পড়িস।

তাতে কি! আমি তো একদিন তোমার গুরুজন হব।

কি করে হবি?

বাঃ! যখন আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে।

শখ তো কম নয়! বলতে বলতে হেসে ফেলল কণা। তারপরেই পথচলতি রিক্সা সাইকেল হাত তুলে দাঁড় করিয়ে তাতে একা এক উঠে বসল। কাপালিকের ওখানে থাকিস। বিকেলে আসব। থাকিস কিন্তু।

নৃপেন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল।

বিকেলে বেরোবে বলে রিক্সাঅলাকে বলে রেখেছিল কণা।

রিকেল চারটের এসে সে এমন প্যাক প্যাক জুড়ে দিল যে দেবেশ্বরবাবু পর্যন্ত বিছানায় উঠে বসলেন। মাগুর মাছের ঝোল ভাত খেয়ে শরীরে বল এসেছে এখন। কণার মাকে ডেকে বললেন, কে এসেছে রিকশোয় ছাখো তো ?

কেউ আসেনি। কণা যাবে কাপালিকের কাছে—

কাপালিক ?

ওমা। জাগ্রত কাপালিক। দিনের বেলায় ভর হয়। নাগা কাপালিক। বাঙালীদের মত কথা বলে। তবে নাগা টানটোন থাকে গলায়—

কী বাজে বকছো।

বাজে নয়। কণা সকালে গিয়ে একটা মন্ত্রপূতঃ ডুমুর নিয়ে ফিরে এল। তোমার কপালে ঠেকাতেই সুস্থ হয়ে গেলে। বিকেলে যেতে বলেছে কণাকে—

কোথায় ?

খালিশপুরের জঙ্গলে থাকেন তো তিনি। সেখানেই আশ্রয়।

খালিশপুরের জঙ্গল ? বলতে বলতে হেডু উঠে বসল। গায়ে হাফসার্ট পায়ে স্যু গলিয়ে এক মিনিটে রেডি। আমিও যাব। খালিশপুরের কাপালিকের খবর কে দিলে কণাকে ?

নেপেন। বড় ভাল ছেলেগো। ওরাই তো তোমার ওষুধ এনেছে কাল। ডাব এনেছে। আজ ভোরে নেপেন কণাকে নিয়ে গেল কাপালিকের কাছে।

তাই বুঝি !

এ-সময়টায় হেডুর বউ হেডুকে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

কণা রিক্সায় উঠতে গিয়ে দেখে তার বাবা আগে ভাগে গিয়ে বসে আছে।

তুমি যেতে পারবে এতটা পথ ? এই শরীরে ?

নে ওঠ। খুব পারব।

জেঠিঘাটা পেরিয়ে রিক্সা যখন খালিশপুরের কাছাকাছি—তখন দেখা গেল পাকুরতলায় দাঁড়ানো পঞ্চমূর্তির মুখে প্রথমে হাসি —তারপর কালি মেরে দিয়ে গেল কে। পবিত্র তো ওরে বাবা গো বলে ছুটতে শুরু করেছিল—আরেকটুকু হলেই সবাই তাকে ছুটন্ত অবস্থায় দেখতে পেত। আসফাকুল খপ করে তার হাত ধরে ফেলল। আস্তে বলল, এখন মাথা ঠাণ্ডা করে এগোতে হবে সবাইকে। নয়ত হনুমানদা ধরা পড়বে। নৃপেনের কেস কেঁচে যাবে। সাবধান সবাই। মুখে হাসি আসে না।

সেই অবস্থায় পাঁচজনে হেড়ু আর কণাকে ওয়েল কাম জানালো। দেবেশ্বর মুখার্জী ওদের কারও মুখের দিকে না তাকিয়েই বলল, কোথায় সেই কাপালিক? এক্ষুনি তার কাছে নিয়ে চল আমাকে। স্যার হাঁটছেন আর বলছেন।

নৃপেন স্যারের পৌছোনোটা দেরি করিয়ে দিয়ে হনুমানদার সটকানোর পথ খোলা রাখতে চাইছিলো। তাই বলল, এখন কেমন বোধ করচেন স্যার? কোন কষ্ট নেইতো?

হেড়ু ভ্রূকুঁচকে তাকালো। কষ্ট কেন থাকবে?

তাতো, ঠিকই স্যার। নাগা কাপালিকের ডুমুর। যে পাবে তাকে কোন রোগই ধরতে পারবে না। ডুমুরটা কি করলেন স্যার?

ডুমুর? কোথায় ডুমুর?

কেন? কণা আপনাকে দেয়নি?

যত্তো বাজে কথা। কাপালিকের ডেরাটা কোন্‌দিকে? শীগগিরি নিয়ে চল।

ওরা সবাই যখন পৌঁছলো—ততক্ষণে পাখি শিকল কেটেছে। কোথায় হনুমানদা! শেয়ালের মাথার ভেতর প্রদীপের শিখা দুলছে অর্থাৎ হনুমানদা সবে তার কাপালিকের আসনে বসেছিল! গতিক সুবিধের নয় আন্দাজ করেই কাছাকাছি কোথায় লুকিয়েছে! সময় হলেই বেরিয়ে আসবে।

কণা বলল, এইতো ছিলেন। খড়ম পর্যন্ত পড়ে রয়েছে!

আসফাকুল বলল, নাগা কাপালিক তো। ইচ্ছে হলেই একটু পাহাড়ে ঘুরে আসেন।

হেডু জানতে চাইল, কোন্ পাহাড়ে?

এই হিমালয় স্যার—

কখন ফেরেন?

তিন চার মিনিটের ভেতর। তবে আজ ফিরবেন কিনা বলতে পারি না। দু'একবার ওপারেও বেড়াতে গিয়েছেন তো—

এবার হেডুর চোখ কপালে উঠলো। জানতে চাইলেন, ওপারে মানে?

আসফাকুল একটুও ঘাবড়ালো না। কারণ এইমাত্র সে একটা জিনিস দেখতে পেয়েছে। ঘর গাঁথার জন্যে হনুমানদা যেখানটায় গর্ত করে মাটি কেটেছিল—তাতে জমা জলে মাথার ওপরের মোটা আমডালের ছায়া পড়েছে। সেই ছায়াতেই আসফাকুল দেখতে পেয়েছে—স্বয়ং হনুমানদা পা ঝুলিয়ে বসে মাথার ওপর থেকে সবই শুনছে।

হেডু আবার জানতে চাইল, ওপারে মানে?

তিব্বতে স্যার—

এসব শুনে ভক্তিতে কণার চোখের খরো দৃষ্টি নরম হয়ে এল। ঠিক সেই সময়ে পবিত্রও মাথার ওপরের হনুমানদার পা-ঝোলানো-ছায়া নিচের ডোবার জলে দেখতে পেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বুড়বুড়ি কেটে তার মুখে হাসি উপচে এল। কিছুতেই আটকাতে পারছে না তাই নিরুপায় হয়ে কেঁদে উঠলো। যদি হাসি থামানো যায়। তারই শেষ চেষ্টা।

হেডু ছুটে এলো। কী হল? কী হল পবিত্র?

নাগা বাবা আর ফিরবে না। আর কোনদিন ফিরবে না—

স্যার ওর কান্না থামাতেই ব্যস্ত। তখন যদি কেউ মাথার

ওপরে তাকাতো—তাহলে দেখতে পেত—নাগা কাপালিক ওরফে হনুমানদা ওরফে জোকার খগেন সরকার আমগাছের ডাল থেকে দোল খেয়ে জামরুলগাছের ঘন পাতায় ঢাকা মোটা ডালে চলে যাচ্ছে। ওদের কথামত যার এখন তিব্বতে থাকার কথা।

তোরা কোন কাপালিকের পাল্লায় পড়েছিস। ভুলিয়ে ভালিয়ে তোদের এ-জঙ্গলে নিয়ে আসে। তারপর একদিন অমাবস্যার রাতে মা-কালীর সামনে বলি দিয়ে দেবে।

অচিন্ত্য বলল, পাঁচজনকে একসঙ্গে স্যার?

না। পাঁচ অমাবস্যায় পাঁচজনকে—একে একে—

কণা বলল, না বাবা। আমি আজই সকালে দেখেছি। খুব ভাল কাপালিক। নাগা—কিন্তু একদম বাঙালীদের মত দেখতে। কথাও বলে বাঙালীদের মতই। তবে একটু নাগা ভাব থাকে বাংলায়। নইলে তাঁর সবই তো বাঙালীর।

নৃপেন হেড়ুকে বলল, অমাবস্যায় বলি দেয় দিক। এ জীবন আর রেখে লাভ কি স্যার? ফাস্ট চান্সে কোনদিন প্রোমোশন পেলাম না।

কি করে পাবে? কাপালিকের পেছনে ঘুরলে চলবে? এখন চল সবাই। সন্ধ্যে হয়ে এল। উনি তিব্বত থেকে ফিরলে একদিন এসে দেখা করে যাব।

হনুমানদা শেষ দিকে দেখা না দিয়ে যে কী ভালই করেছে। নৃপেন বুঝতেই পারছিল, একদম শেষ মুহূর্তে নাগা কাপালিকের আসন থেকে হনুমানদা উঠে গেছে। প্রদীপ নেভানোরও ফুরসুৎ পায়নি। আরেকটু হলেই হয়ত হেড়ুর হাতে পড়ে যেতো।

হেড়ু হাঁটতে হাঁটতে আবার বলল, তোদের কাপালিকদা তিব্বত-টিব্বত কিসে যাতায়াত করে?

আসফাকুল বলল, ওঁর তো কোন গাড়িঘোড়া লাগে না।

তাছাড়া তেমন স্পিডের গাড়িও তো বাজারে বেরোয়নি যে একখানা দেখেশুনে করে নেবেন ?

তিব্বত যেতে আসতে কেমন সময় নেয় ?

আসফাকুল হিশেব কষার ভঙ্গীতে বলল' প্রপার লাসা থেকে—ব্যাক টু খালিশপুর—তা দু'এক সময় নাগা বাবা বিশ মিনিটেও যাতায়াত করেছেন।

যখন ধীরে সুস্থে যাতায়াত করেন—তখন কী রকম সময় নেয় ?

লাসা—খালিশপুর বড়জোর এক ঘণ্টা।

এবার হেডু জানতে চাইল, এ কাপালিক বাবা খালিশপুরে কতদিন ?

আসফাকুল বলল, কোন রুট ম্যাপ নেই। আকাশ দিয়ে যাতায়াত করেন তো। একদিন সাহারা মরুভূমি হয়ে—এ-পর্যন্ত বলে আসফাকুল অন্যদিকে চলে গেল। তখনকার সাহারা তো এমন মরুভূমি ছিল না। দিব্যি সবুজ গাছপালা চারদিকে—মাঝে মাঝে কালো জলের দিঘি। সাহারা হয়ে নাগা বাবা দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছিলেন। ইণ্ডিয়ায় সেদিন ভরা পূর্ণিমা। পৃথিবীর সে কী রূপ! চোখ ফেরানো যায় না। নেমে পড়লেন খালিশপুরে—

হেডু থামিয়ে দিয়ে বলল, ওসব শুনতে চাইনি। এখানে তিনি কতদিন ?

জায়গাটা ভাল লেগে গেল। তারপর সেই থেকে আছেন এখানে।

তবু কদ্দিন ?

তা তিনশো বছর তো হবেই। এক একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা বলেন আবার আওরঙ্গজেবও এসে যান। তাঁর সিকি আধুলির ছাঁচ নাকি কাপালিকদার নিজের হাতে তৈরি। তখন ফ্রেডারিক দি গ্রেটের টাকা পয়সার একটা সুমসাম করে দিয়ে নাগা বাবা সবে যমুনার তীরে আশ্রম করে আছেন। সেই সময় এক

দিন ভোরবেলা দিল্লিথেকে হাতির পিঠে আওরঙ্গজেব এসে হাজির। হাওদা থেকে নেমে হেসে বললেন; আপনার গুণ চাপা থাকার কথা নয়। ফ্রেডারিকের দরবারে হিন্দুস্থানের শাহেনশার দূত সব শুনেছে। দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ চলছে অনেকদিন। সেখানে কিছু মোহর ছাড়বো। আপনার সব দেখেশুনে করেকম্মে দিতে হবে।

তোদের কাপালিকদা তো ভাল গল্প বলে—

হেডুর এই অবহেলা আসফাকুল গায়ে মাখল না একদম। বরং স্যারকে ঘাবড়ে দিতে বলল, এই তো সেদিন কাপালিকদা বলছিল : তোদের হেডমাস্টার মশাইয়ের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। কিন্তু বাঁচাবি তোরাই।

অচিন্ত্য, নৃপেন, পবিত্র, হায়দার—সবাই আসফাকুলের বানানোর ক্ষমতায় অবাক হচ্ছিল। কাপালিকদা ওরফে হনুমানদার নামে যা ইচ্ছে বলে যাচ্ছে। একদম ঠিক গল্পের মত।

হেডু বলল, এ আর কঠিন কি! তোরাই এসে তোদের নাগা বাবাকে সব বলে রাখছিস। আর সে ভবিষ্যদ্বাণী করে যাচ্ছে। এর পর যখন ধরে ধরে বলি দেবে—তখন টের পাবি।

পবিত্র বলল, ব-বলির সময়ে টের পেয়ে আর লাভ কি। অবশ্য এ-জীবন রেখেই বা লাভ কি স্যার! সাত পিরিয়ডের সাত পিরিয়ডই আমি মার খাই স্যার।

সন্ধ্যের ফিরতি পথে কণা সমেত হেডু। ওদের কথা শুনতে এক একবার হাঁটার স্পীড্ কমিয়ে আনছে। উল্টো দিক থেকে ঘরফিরতি লোকের চলার শেষ নেই। তাদের সঙ্গে নৃপেনদের গায়ে লেগে ঘষাঘষি হয়ে যাচ্ছে। ওরই ভেতর কণা পবিত্রর কথায় খুক খুক করে হেসে উঠল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, একটু পড়লে পারিস। তাহলে তো অত ভোগান্তি হয় না। সবাই ভালবাসে—

কণার এই শেষের কথাটা নৃপেনের মাথায় গেঁথে গেল।

হেডুর সঙ্গে সঙ্গে কণা বাড়ির ভেতর চলে যেতেই আসফাকুলকে

ধরল নৃপেন। একটু পড়লে পারিস। তাহলে তো সবাই ভালবাসে। এ কথাটার মানে কি? বিশেষ কোন মিনিং হয়? এরকম নানা প্রশ্ন করতে লাগল নৃপেন। সারাক্ষণ গুল দিয়ে দিয়ে আসফাকুলের মাথা ঘুরছিল। তার ওপর এখন হনুমানদার জন্যে কয়েকটা টাকা জোগাড় করে নিয়ে যেতে হবে। ওবেলাই বলেছিল, আজ সন্ধে অব্দি চাল আছে। আনাজপত্তর কিছু নেই। এখন টাকা জোগাড় মানে ডুম বিক্রি। তাড়াতাড়ি বলে দিল, কণা বলতে চাইছে—ওগো নেপেনবাবু—একটু মন দিয়ে পড়াশুনো কর। তাহলেই ভালবাসবো!

নৃপেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল. তাহলে আমাকে ভালবাসে? কি বলিস!

এখন মাথা ঘামাবার অবস্থা নেই নৃপেন। এখুনি ডুম খুলে নিয়ে গিয়ে মইত্থার দোকানে বেচতে হবে। তারপর বাজার করে হনুমানদার ডেরায়। হাতে একটা পয়সা নেই লোকটার।

এত যে পয়সা দেওয়া হয়—সে-সব পয়সা কোথায়?

নৃপেনকে থামিয়ে দিল আস্ফাকুল। বোকার মত কথা বলিসনে। একটা বড় সার্কাসের সেরা জোকার ছিল হনুমানদা। সে কেন খালিশপুরের জঙ্গলে বসে থেকে মশার কামড় খাবে?

তাই বলে সব পয়সা খরচ করে ফেলবে— আর আমরা ইলেকট্রিকের ডুম খুলে খুলে বেচবো?

খরচে হাত। কি করবি বল? হনুমানদা না থাকলে তোর ওপর কণার মন ভিজতো?

সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞ নৃপেন মনে মনে বলে উঠলো, এ আমি কী বলতে যাচ্ছিলাম তোমাকে হনুমানদা? আস্ফাকুলকে মুখে বলল, চল যাই। ডুম খুলিগে। কাল সকাল থেকে পড়তে বসব। আজ বাড়ি গিয়ে সব বইয়ের মলাট দিতে হবে।

ওরা পাঁচজনে শহরের শেষ দিকে বেনেখামার পাড়ায় চলে

গিয়ে নির্জন রাস্তার লাইটপোস্টে উঠে যেতে লাগল তর তর করে। এদিকটায় বসতি নেই প্রায়। ফাঁকা ফাঁকা মাঠ। দু'একখানা বাড়ি। সন্ত জ্বলে ওঠা ডুমগুলো তখনো তত গরম হয়নি। এক প্যাঁচ দিয়ে আলগোছে খুলে নিয়ে গরম আলুসেদ্ধর মত আলতো করে এক একটা ডুম নরম ঘাসের ওপর রাখতে লাগল।

ডুম চুরি এক বিচ্ছিরি নেশা। একবার খুলতে শুরু করলে সারা শহর অন্ধকার করে দিতে ইচ্ছে করে। মইত্যা তো বলেই—দে অন্ধকার করে। যত আনবি তত কিনে নেব। নগদ পয়সা। কোন ধারবাকি নেই।

আজ ওদের নেশা ধরে গেল। খুলতে খুলতে একদম্ শহরের শেষ লাইটপোস্টে এসেছে। শেষেরটা খুলছে আস্ফাকুল। নিচে দাঁড়িয়ে নৃপেন। অচিন্ত্য হায়দার, পবিত্র এখনো ছ' লাইটপোস্ট ওপাশ দিয়ে শহরের বুকের দিকে এগোচ্ছে। এদিকটাই আরও বেশী রিস্কি।

প্রায় মাঠের ভেতর দিয়েই কুমুদ স্যার এগিয়ে এলেন। সন্ধ্যার আবছা আলোতেও হাসিমুখখানা দেখা যাচ্ছিল। শাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরনে। হাতে গোটানো ছাতা। টাকমাথার চারদিক দিয়ে কাঁচা পাকা চুলের ঘন বার্নিশ। হেসে লাইটপোস্টের ওপর দিকে তাকালেন। কে? আস্ফাকুল। সাবধানে নামিস। নইলে কেটে যাবে। কাচ তো—

নিচে দাঁড়ানো নৃপেনের প্যান্টের পকেটে একটা ডুম আপনা আপনি শব্দ করে বার্স্ট করল। নৃপেন ভয়ে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে। স্যার শুধু বললেন, পা কেটে যাবে। কাচগুলো ফেলে দিয়ে আয়—

আসফাকুল নিচে নামতেই কুমুদ স্যার বললেন, বেশি রাতে বেরোলে পারিস। তখন লোকজন থাকে না। ডুম খুলতে খুলতে একদম আমাদের জেলাস্কুল পর্যন্ত চলে যাবি। স্কুলের সাজি নেই

বাড়িতে ? বেতের তৈরী ? তাই সঙ্গে নিয়ে যাবি। ড্রামগুলো আলগোছে হাতে রাখবি। একটাও ফাটবে না।

আসফাকুল সড়সড় করে নেমে এসেই স্যারের দিকে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকালো। ভাবখানা—স্যার আপনি এখন যা ইচ্ছে হয় করুন। আমাদের মারুন। ধরুন। কিংবা জেলে দিন।

কুমুদস্যার বললেন, এই তো চাই। এখন কম বয়স। ঘুরবে। খাটবে। এখন তোমাদের কত পয়সা দরকার।

আসফাকুল চমকে উঠলো। তবে কি হনুমানদা ধরা পড়লো ? হেড়ু ধরিয়ে দিল ?

কুমুদস্যার বললেন, এখন তোমাদের ফার্স্ট হতে হবে না ? তা হতে যে অনেক পয়সা দরকার—

সারা শহরে আর মাত্রকয়েকটা ড্রাম আছে। সবে সন্ধ্যেরাত। সেই সময় কুমুদস্যার ওদের নিয়ে বেনেখামারের পল্লীমঙ্গল স্কুলের বারান্দায় বসলেন। তালাবন্ধ স্কুলঘর। একটা গরু বারান্দায় দাঁড়িয়ে। কুমুদস্যার ওদের নিয়ে গোল হয়ে বসলেন। এখন তোদের কত পয়সা দরকার—

আসফাকুল, পবিত্র, হায়দার, নৃপেন, অচিন্ত্য—সবাই অবাক। ড্রাম ঝাড়া হাতে নাতে ধরেও স্যার কিছু বললেন না! উপরন্তু উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। পরিষ্কার বলছেন—এখন তোদের কত জিনিস ঝাড়তে হবে। তোদের কত টাকা দরকার এখন।

আসফাকুল বলল, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন স্যার।

নৃপেন উঠে গিয়ে গরুটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এল।

স্যার বললেন, তোদের ফার্স্ট হতে হবে না ?

নৃপেন বলল, ফার্স্ট ? আমরা স্যার ?

হ্যাঁ তোরা। কেন ফার্স্ট হবিনে ?

কিন্তু আমরা স্যার ? আমরা তো কিছু জানিনে।

জানার দরকার কি ? আগে ঠিক কর ফার্স্ট হবি কিনা ?

একসঙ্গে পাঁচজন ফার্স্ট ?

স্যার বললেন, তা অবিশ্যি হয় না। তোদের ঠিক করে নিতে হবে—কে কি হবি ?

মানে স্যার ?

তোরা পাঁচজনে ফার্স্ট থেকে ফিফথ হ।

কী করে হব স্যার ?

সিম্পল। আমার শালা কোশ্চেন ছাপছে। আমি কোশ্চেন আনিয়ে দেব।

দেবে কেন স্যার ?

টাকা দিলে বাঘের দুধ মেলে। মোটমাট দু'শো টাকা জোগাড় করতে পারবি নে ?

দু'শো স্যার ?

হ্যাঁ। বঙ্গোপসাগরে ভাসন্ত জাহাজে প্রেস। সেখানে কোশ্চেন ছাপা হচ্ছে। ছোট ডিঙি নিয়ে গিয়ে ভেড়াতে হবে জাহাজের গায়ে। আমার শালা তখন কোশ্চেন নামিয়ে দেবে ডিঙিতে। দু'শো টাকা জোগাড় করতে পারবি নে তোরা ?

সারা শহরের ড্রাম বেচলেও তো হবে না স্যার—

মিউনিসিপ্যালিটির জলের কলের মুখগুলো খুলে ফেল। তামা আছে ওতে। ভাল দাম পাবি।

সে খুব রিস্ক স্যার।

আসফাকুলকে থামিয়ে দিয়ে নৃপেন বলল, নো রিস্ক নো গেইন। ঝুঁকি তো থাকবেই। তা না হলে কি ফার্স্ট হওয়া যায় ? আমরা জোগাড় করব স্যার।

অচিন্ত্য বলল, একেবারে দু'শো টাকা স্যার ? একটু কমসম করা যায় না ?

কুমুদস্যার তেতে উঠলেন। একি মাছের বাজার? ফার্স্ট হওয়া নিয়ে কথা! তা' নিয়ে দরাদরি?

নৃপেন স্যারকে শান্ত করল। ওর ওপর রাগ করবেন না স্যার। অচিন্ত্য কিছু বোঝে না। ওকে ক্ষমা করে দিন স্যার।

কুমুদ স্যার এক কথায় ক্ষমা করে দিলেন। বললেন, শনিবার বেলা দু'টোর মধ্যে টাকাটা চাই কিন্তু। বলেই স্যার উঠে গেলেন। স্যারও অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন—অমনি পবিত্র বলল, ওই যাঃ! আসল কথাটাই বলা হল না। উত্তরগুলো কে লিখে দেবে?

আগে কোশ্চেন তো আসুক। বলেই নৃপেনের মনে পড়ল, কণা আজই বলেছে—ভাল করে পড়লে পারিস। তাহলে সবাই ভালবাসবে। সবাই মানে—এখানে বুঝে নিতে হবে—কণা। কথাটার মানে আবার আরেকবার জানতে চাইবে বলে আসফাকুলের দিকে তাকালো। কিন্তু আসফাকুলের মুখ দেখে কিছু বলার সাহসই পেল না নৃপেন।

আসফাকুল বলল, ড্রামগুলো গুণতে শুরু কর তো। মইস্তার দোকান না বন্ধ হয়ে যায়—

গুণে দাঁড়াল মোট একাশি। অচিন্ত্য বলল, একাশিটা বেচলে তবে গোটা তিরিশেক টাকা হবে—

আসফাকুল বলল, তাহলে দু'শো টাকা জোগাড় করতে কত ড্রাম বেচতে হবে একবার ভেবে ত্যাখো। তাও শনিবারের মধ্যে টাকা দিতে হবে—

পবিত্র এই অন্ধকার বারান্দাতেও হেসে ফেলল। তা- তা-হলে বুঝে ত্যাখো ফার্স্ট হওয়া কত কঠিন। দু'শো টাকার ড্রাম তো আমি হিসেবই করে উঠতে পারবো না। তারপর আ-আছে ফা-ফার্স্ট হওয়া। তা-তা-তারপর ক-কণার ভালবাসা। কি কঠিন জিনিসে যাচ্ছিস নৃপেন। একবার ভে-ভেবে ত্যাখ ভাই—

নৃপেন রাগে বার্স্ট করল। ভালবাসার কি বুঝিস তুই? ভালবাসার জন্যে মানুষ কত কি করে জানিস?

কি করে?

যুদ্ধ করে। আগুনে ঝাঁপ দেয়। কখনো কখনো সুইসাইড করতে হয়। শুনিসনি?

তাই বলে হনুমানদাকে আধপেটা রেখে দিয়ে সারা শহর অন্ধকার করে ড্রম খুলতে হবে? আমরা তো ধরাও পড়ে যেতে পারি। আসফাকুল আরও কিছু বলত। কিন্তু একদমে আর কিছু মাথায় এলো না বলে থেমে গেল।

নৃপেন বলল, আমার জন্যে তোদের খুব খাটুনি হচ্ছে। জানি। কিন্তু কি করব?

অচিন্ত্য তখন ক্যাপ্টেন স্মিথ হিসেবে মিস্টার ব্লেক ওরফে নৃপেনের জন্যে এগিয়ে এল। ভালবাসার জন্যে তো অনেক কিছু করতে হয়। এখন পিছোলে চলবে কেন? আমরা সবাই এগোবো।

হায়দার এতক্ষণ মুখ খোলেনি। এবারে বলল, ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে ফাউ আরেকটা জিনিস হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়ে যাচ্ছি। সেটা ভুললে চলবে কেন? অ্যান্যুয়ালের পর আমরা সবাই প্রাইজ নিয়ে বেরোচ্ছি স্কুল থেকে—

এবারও বাগড়া দিল পবিত্র। সে-সেই দৃশ্যই ম-মনে ভাবো। কোশ্চেন তো লিক করলে। কিন্তু উত্তরটা কে লিখবে?

কুমুদ স্যার লিখে দেবেন।

হলে ঢুকে? পাঁচজনের খাতায়?

নৃপেন বলল, তা কেন? পাঁচখানা খাতা সরিয়ে আনতে হবে আগে থেকে। স্যার ডিকটেশন দেবেন। আমরা হনুমানদা ডেরায় বসে ডিক্টেশন নিয়ে লিখে নেব।

তাও তো ভুল বেরোবে। আ-আমরা কি কো-কোন বানান জানি—

কারেক্ট করিয়ে নেব। তারপর হলে খাতা জমা দেবার সময় হলের খাতা জামার নিচে সরিয়ে নেব। বের করে দেব আগে থেকে লেখানো খাতা—

আসফাকুল হাসতে হাসতে বলল, সব তো হল! কিন্তু পাঁচখানা খাতাই যদি এক ভাষায় লেখা হয়—স্যারেরা বলবেন—টুকলিফাই হয়েছে। তখন?

নৃপেন বলল, পাঁচজনের পাঁচরকমের ভুল তো থাকবেই। কুমুদস্যারের বরং কারেক্ট না করে দিলেই ভাল হবে। কি বলিস।

পবিত্র বলল, তাহলে তো এত কষ্টের ডুম চুরির টাকা স-সব জ-জলে যাবে—ক্লাসে কি পড়ায় আমরা তো তার কিছুই জানি না। লাস্ট সেই ক্লাস থ্রিতে পড়াশুনো করেছি। তারপর থেকে তো থার্ড চান্সে প্রোমোশন পেয়ে আসছি। আ-আমরা কি-কি কিছু জা-জানি? কোশ্চেন জেনেও—ডিক্টেশন পে-পেয়েও তো সবাই জি-জিরো পাবো। বানানগুলোর কি হবে?

নৃপেন ভাবনায় পড়ল। কথাটা তো মন্দ বলিসনি। তাছাড়া সব সাবজেক্টে পাঁচখানা করে খাতা—তা ধর চল্লিশখানা খাতা হবে আমাদের পাঁচজনের। সেগুলো কি করে হলের খাতার সঙ্গে পালটে পালটে জমা দেব। বাইচান্স যদি ধরা পড়ি? তখন? এমনিতেই তো স্যারেরা আমাদের বেশি বেশি করে গার্ড দেন—

অচিন্ত্য বলল, একটা কথা বল নৃপেন—তুই কণাকে ভালবাসিস? না, বাসিস না? বুকে হাত দিয়ে বল—

নিশ্চয়ই লাভ করি।

কণার জন্যে এ ঝুঁকি নিতে পারবি না? একটু রিস্ক নিবি না? প্রেমের জন্যে কত লোক তো সুইসাইড পর্যন্ত করে। ছিঃ! একটা শুভ কাজের গোড়াতেই এত প্রশ্ন? বড় কাজ কি করে করবি তাহলে?

হায়দার অনেকক্ষণ পরে আবার কথা বলল, ডিঙি নৌকোয় বঙ্গোপসাগর ? সেখানে যা বড়'বড় ঢেউ—

সবাই একসঙ্গে অন্ধকার মাঠের দিকে তাকালো। যেন পল্লীমঙ্গল স্কুলের বারান্দায় একেবারে নিচু থেকেই বঙ্গোপসাগরের শুরু। এখন শুধু পায়ে নামা ঠিক হবে কি—

আসফাকুল বলল, চল তো যাই মইন্থার দোকানে। সেখান থেকে হনুমানদার ডেরায় যাব। তাকে বঙ্গোপসাগরের ব্যাপারটাও জানানো দরকার। হেডু আবার জায়গাটা চিনে ফেলল—কোন বিপদ না ঘটে।

তিন কিলো চাল। বড় বড় হাঁসের ডিম। ফুল-কপি চারটে। তাছাড়া গণেশের সরষের তেলের একটা টিন হাতে ওরা পাঁচজনে যখন হনুমানদার ডেরায় এসে ঢুকলো—তখন শীতের চোটে হনুমানদা সবে জঙ্গলের শুকনো ডালপালা ঢিবি করে আগুন দিয়েছে। জঙ্গলের ভেতর মানুষ-প্রমাণ আগুনের শিখার উল্টো দিকে হনুমাদা একজন সাধুবাবাদের মতই বসে। ওদের দেখে বলল, এসেছিস। এবার আমি সত্যি সত্যি তিব্বত চলে যাব।

তিব্বত কোথায় বল তো হনুমানদা।

কেন ? বালুরঘাট, বিষ্ণুপুর, বরাকর ছাড়িয়েই তিব্বত। মাঝে অবশ্য একটা নদী পড়ে। কোপাই। ভয়ঙ্কর ঢেউ। বড় বড় সাত মাল্লার বজরা ডোবে—

আমাদেরও তো বঙ্গোপসাগরে যেতে হচ্ছে হনুমানদা। সেখানেও ভীষণ ঢেউ—

হনুমানদাও তাকিয়ে পড়ল আসফাকুলের মুখের দিকে।

হ্যাঁ। সত্যি। বড় জাহাজে কোশ্চেন ছাপা হয় সেখানে। ডিঙি নৌকো নিয়ে গিয়ে জাহাজের গায়ে ভেড়াতে হবে। তখন কোশ্চেন নামিয়ে দেবে—

কি ব্যাপার ?

আসফাকুল তখন সব একে একে বলল। সব শুনে হনুমানদা বলল, সে তো ভাল কথা। নদীপথে ওদিকটা আমার অনেকখানি ঘোরা আছে।

সমুদ্রের ভেতর নদী পেলে কোথায় ?

সবই তো জল। যাগগিয়ে! এখন তো তোদের হেডমাষ্টার এ-ডেরা চেনে। ধর যদি পুলিশ নিয়েই হাজির হয় ?

গাছে উঠে যাবে।

আমি কি হনুমান ?

হনুমানই তো! গাছ থেকে হুপ করে লাফিয়ে পড়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করেছিলে। মনে নেই হনুমানদা ? আমি জোকার যোগেন সরকার। আমি আর এখানে থাকবো না। আমি চললাম।

রাগ করছো কেন ? এই ছ্যাখো। কত জিনিস নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে।

ফেলে দে ওসব। আজ ক'মাস ধরে এই জঙ্গলে বসে মশার কামড় খাচ্ছি। আর বাইরের লোক এলেই গাছে উঠে যাচ্ছি।

আমাদের ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে ? থাকতে পারবে ? আমরা ছাড়া তোমার কে আছে ?

তা ঠিক বলেছিস। জগৎসংসারে আমার আর কেউ নেই। ছোটবেলা থেকে লোক হাসিয়ে বেড়াচ্ছি।

কি রকম ? আসফাকুল বলতেই ওরা সবাই মিলে হনুমানদাকে ঘিরে বসল। সন্ধ্যেরাতের খালিশপুরের জঙ্গল। গাছের পাতায় পাতায় জোনাকি। এদিক সেদিক অজানা জন্তুজানোয়ার শুকনো পাতা মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সড় সড় করে কি যেন নেমে গেল সামনের পাকুড় গাছটা থেকে। ওরা আরও ঘন হয়ে বসল।

আমার মা-বাবাকে দেখিনি। ছোটবেলায় গঞ্জে-গাঁয়ে গাছতলায় নয়ত মুদিখানার বারান্দায় শুয়ে থাকতাম। তারপর একটু বড় হয়ে হাপু গেয়ে বেরিয়েছি। মুখে শব্দ করে—নিজের পিঠে নিজেই বাঁ

হাতে লাঠির বাঁড়ি মেরে আওয়াজ তুলতাম—আর সেই তালে গাইতাম—

—সুন্দরী গো সুন্দরী
কার তরে করেছো এত মনভারি—

বেশ সুর করেই গাইতে লাগল হনুমানদা। সেই সুরে ওদের পাঁচজনের মাথা দুলতে লাগল। রেড়ির তেলের আলোয় মাথাগুলো ছায়া ফেলছে। কোত্থেকে হনুমানদার পোষা কুকুরটা এসে দাঁড়াল। তাই না দেখে রেড়ির আলোর মাঝখানটায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে হনুমানদা নাচতে লাগলো। মুখ বাজিয়ে। লাঠির অভাবে বগল বাজিয়ে—আর সেই সঙ্গে গান—

তুমি আমার ডালের অম্বল
আমি তোমার চচ্চড়ি—
সুন্দরী গো সুন্দরী
কার তরে করেচো এত মন ভারি—

অন্ধকার জোনাকি-জ্বলা জঙ্গলে রেড়ির আলোয় হনুমানদা নাচছিল। সঙ্গে পাক খাচ্ছে তারই এ-ক'মাসের পোষা কুকুর। দু'মাইল দূরে শহর। নদীরঘাটে 'ফ্লোরিকান' কিংবা 'গারো' স্টিমার গম্ভীর ভোঁ দিয়ে উঠলো। এবার সার্চলাইটগুলো জ্বালিয়ে নদীতে ঢেউ তুলে এগোতে থাকবে। সে-ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়ার মুখে ডিঙি নৌকাগুলোকে দোলাবে। নৌকার গলুইতে মাঝিরা তখন ছালোন দিয়ে সবে ভাত মেখেছে। এসব ভাবতে ভাবতে নৃপেন বঙ্গোপসাগরে চলে যাচ্ছিল। জাহাজের গায়ে তার ডিঙি ভিড়ছে। টপাং করে এ্যানুয়ালের কোশ্চেনের প্যাকেটটা কুমুদস্যারের শালা ডিঙিতে ফেলে দিল।

রাত হল। চলি হনুমানদা।

কাল আসিস। বঙ্গোপসাগরে যাওয়ার ভেলা বানাবো সবাই মিলে।

ভেলা ডুবি হয়ে যাবে হনুমানদা। ডিঙি চাই। ডিঙি। বুঝলে—

ছোটমত একটা লঞ্চ দেখনা। বেশ তরতর করে চালিয়ে নিয়ে যাব।

লঞ্চ চালাতে পার ?

ও আবার চালাবার কি আছে। এ তো রেল লাইন নয়। কিংবা পিচরাস্তাও নয়। জলের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চালিয়ে চলে যাব। ঘণ্টাখানেক চালালেই হাত সেট হয়ে যাবে।

তাই বুঝি। কি মজা। বলতে বলতে নৃপেন লাফিয়ে উঠলো। আমাদের হনুমানদা কত জানে। মাথা নিচু করে নৃপেন প্রণাম করতে যাচ্ছিল। তার দেখাদেখি অচিন্ত্য।

হনুমানদা সরে গেল। কি করছিস ? অ্যাঁ! লঞ্চ কিনে ফেলেছিস কবে!

কিনিনি হনুমানদা।

তবে ?

একটা লঞ্চ তো মোটে! বেশি কিছু নয়। একটা লঞ্চ মাত্র! ও ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। বলতে বলতে নৃপেন হো হো করে হাসতে লাগল।

বাকি সবাই তো অবাক। এই তো সেদিন একটা সাইকেল জোগাড় করতে বিজয় মোদকের দোকানে কী হেনস্তাই না হতে হল। এখন বলে কি না—আস্ত একটা লঞ্চ—তাও জোগাড় করা নাকি ভীষণ সহজ। সারা সহরে তো লঞ্চের কোন দোকান নেই। অচিন্ত্যও অবাক হয়ে তাকিয়ে।

এমন সময় আসফাকুল চমকে উঠলো। কী পাগলের মত হাসছিস ? কণার প্রেমে পাগল হয়ে গেলি!

তখনো নৃপেন হাসছে আর বলছে—একটা মোটে লঞ্চ তো ? সে জোগাড় হয়ে যাবে চেয়েচিন্তে। তারপর বঙ্গোপসাগর। কোশ্চেন

পেপার। কুমুদস্যারের ডিরেক্টশন। ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ্—সবই আমরাই হয়ে যাব। ফার্স্ট চান্সে প্রোমোশন দেওয়ার সময় হেড্ অবাক হয়ে তাকাবে। আমরা কিছু জানি না—এমন করে তাকাব। তারপরই কণার বিয়ে—

আরো কি বলতো নৃপেন। হনুমানদা থামালো। বঙ্গোপসাগর শুনেছি খুব বড় জায়গা। কোথায় জাহাজটা থাকবে? শেষে অথৈ জলে খুঁজে না বেড়াতে হয়।

সে চিন্তা নেই। কুমুদস্যার দেখিয়ে দেবেন।

সঙ্গে যাবেন তিনি?

না স্কুলে তো ছুটি নেই এখন। ইন্সট্রুমেণ্ট বক্সের কম্পাসটা নিয়ে ওঁর বাড়ি যেতে হবে খুব সকালে। ম্যাপ বই খুলে নীল রংয়ের সমুদ্রে দ্রাঘিমাংশ লঘিমাংশ খুঁজে নিয়ে জাহাজের পজিশান পয়েন্ট করে দেবেন।

শুধু পয়েণ্ট করতে কত নিচ্ছেন?

শুধু পয়েণ্ট নয়? শালাকে একখানা পার্সোনাল লেটারও লিখে দেবেন। ওপরে লেখা থাকবে কনফিডেনসিয়াল।

তবু কত নিচ্ছেন শুনি?

মাত্র দু'শো টাকা।

কত ড্রাম বেচলে পাবে?

তা সারা শহর অন্ধকার করে দিয়ে ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউসের ড্রামও খুলতে হতে পারে।

এতটা পোষাবে?

নো রিস্ক নো গেইন। না হলে কণাকে পাব কি করে?

ওঃ! তা ঠিক, বলেই হনুমানদা থামলো। তারপর বলল, সাবধানে যাস। রাস্তাটা অন্ধকার। তারপরেই চেঁচিয়ে বলল, ড্রামের আগে কিন্তু লঞ্চ। মনে থাকে যেন।

সে ভেবো না কিছু।

আসফাকুল আস্তে নৃপেনকে বলল, আস্ত একটা লঞ্চ পাবি…কোথায় ?

দেখিস না ! কোত্থেকে আসে !

বেলা আড়াইটের সময় 'এস এস মাগুরা'র সারেংঘরের দরজায় খট খট করে কড়া নড়ে উঠলো। এই সময় ক্যাপটেন মহাবুব ঘুমোয়। তখন বয়লার, নোঙর, ডেকের কোন মাল্লারই বুকে এ সাহস হবে না যে, মহাবুবের ঘুম ভাঙায়। রাত ন'টায় লঞ্চের বয়লার গরম হয়ে উঠলে স্টিম এসে জলকাটার চাকার ফাৎনায় ঘা দেবে। তখনই লঞ্চ ভোঁ দিয়ে মাগুরা রওনা হবে। তার আগে পাটাতন তুলে নেওয়া হয়। নোঙরের শেকল গোটানো হয়। প্যাসেঞ্জাররা যে যার মত বিছানা পেতে শুয়ে পড়ে। শীতের রাত বলে দু'ধারের ত্রিপল নামিয়ে দেওয়া হয়। তখন চাকা জল কাটতে শুরু করে। বয়লার বেশি বেশি কয়লা খায়। ইঞ্জিনের একটা ধকল আছে তো। সার্চলাইট জ্বলে ওঠে। আশপাশের ডিঙিগুলো ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলতে থাকে।

মাগুরা লঞ্চের বড় তিন গ্লাস সরবৎ খেয়ে মহাবুব সারেং সবে শুয়েছে। সরবতের সঙ্গে মাগুরার হাটবারে কেনা আস্ত বড় একটা মোরগ ভাজা খেয়েছে মহাবুবদা। লাল চোখ করে দরজা খুলেই মহাবুব অবাক। তোমরা? এই দুপুরবেলা?

আসফাকুল এগিয়ে এসে সালাম করল। খোদা হাফেজ।

মহাবুবদা হাত তুলে বলল, সেলাম আলেকুম। কি মনে করে?

অনেক দিন দেখা হয় না। নদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম—শুশুকরা ভাসছে আর ডুবছে। জলের ভেতর ডিগবাজি খাচ্ছে। তাই তোমার কথা মনে পড়ে গেল।

বেশতো। বেশতো। বসে পড় তোমরা। আমার ঘরের চারদিকের রেলিং ঘেরা বারান্দায় দাঁড়ালেই আরও অনেক কিছু জিনিস দেখতে পাবে। ডাঙার নিয়মের সঙ্গে জলের নিয়ম মেলে না। এখানে কোন জায়গা কারও না। যে যেখানে পারে ভাসছে ডুবছে।

এ নদীপথের সবটা তুমি জানো ?

সব না জানি—কিছু কিছু তো জানি। কোথায় বাঁক নিতে হবে—কোথায় চড়া আছে—এসব তো নখদর্পণে রাখতে হয়। তারপর খোদার মার আছে—

ওরা পাঁচজনই কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো। মহাবুব সারেং তখন খোলসা করে বলল। সব জেনেশুনেও তো লঞ্চ ডুবি হয়। বড়জল থেকে যদি তুফান আসে—তখন আর বাঁচাবে কে !

বড়জল ?

ওই সমুদ্দুর আর কি ? যখন টান দেয়—যেন নদীর জলের নিচে তিরিশ চল্লিশ মাইল দূর থেকে সোঁ সোঁ করে ডাকে। তার ভেতরে পড়লে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই।

সমুদ্দুর কত দূর ?

চল্লিশ বিয়াল্লিশ মাইল হবে। কেন ? যাবি নাকি ?

নাঃ। বলে আসফাকুল থামলো। তারপর দম নিয়ে বলল, যাবই বা কি করে ? রাস্তাঘাট চিনি নাকি আমরা।

কম্পাস দিয়ে দিক দেখিয়ে দেব। দেখে নিস। খুব সোজা তবে ভারি স্টিমার ছাড়া সেখানে যাওয়ার মানে হয় না। তুফান উঠলে একদম ফিনিশ।

নদীতে সুন্দর বাতাস। শীত চলে যাওয়ার মুখে বিকেলের রোদ্দুরে সবাই আরাম পাচ্ছিল। সারেংঘরের কাচের জানালা দিয়ে ওরা পরিষ্কার দেখতে পেল, ওইতো·ওইযে ভৈরব মোড় নিয়ে রূপসায় গিয়ে পড়ছে। তারপর তো সবাই জানে—রূপসা গিয়ে সিপসা নদীতে পড়েছে। সিপসা বঙ্গোপসাগরে।

মহাবুবদা তারই ভেতর এটা দেখাচ্ছিল। ওটা খুলছিল। একটা দড়ি টানতেই পাগলাঘণ্টা বেজে উঠলো। নদীর বুক কাঁপিয়ে ঘণ্টা বেজেই যাচ্ছিল। আশপাশের পাখিগুলো উড়ে পালালো।

মহাবুবদা হাসতে হাসতে ঘণ্টা বাজানো বন্ধ করলো। তুফান উঠলে কিংবা দিক হারালে আমরা পাগলাঘন্টি দিয়ে থাকি।

ওরই ভেতর নৃপেন দেখে রাখলো—কোন্ জায়গায় পায়ে চেপে ধরে হাল ঘোরালেই লঞ্চ মুখ ঘুরিয়ে নদীর ওপর দিয়ে চলতে শুরু করে। কোন্ কপিকলে শেকল গোটালে তবে নোঙর উঠে আসে। পেছনের আলোর সুইচ মাথার ওপর। সামনের সার্চলাইট জ্বলে ওঠে ম্যাপের পাশের লাল সুইচটা টিপলেই।

আজই সকালে কুমুদস্যার বঙ্গোপসাগরে 'এস এস এগজামিনেশন' -এর হদিশ দিয়েছেন ওদের। যে সে জাহাজ নয়। সারা বাংলার সতেরোশো স্কুলের কোশ্চেন ছাপে। বঙ্গোপসাগরের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে থাকে তাই। রোজই জায়গা পালটায়। পাছে কেউ টের পায়।

স্যার বললেন, আমার শালা অভিরাম ওখানে আজ সতেরো বছর কাজ করছে। কাজটা খুবই কঠিন। সতেরো বছর ওই এক জাহাজে বসে অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, স্যাংস্কৃটের কোশ্চেন ছেপে যাচ্ছে। মুখ বুজে থাকার জন্যে মোটা টাকার অ্যালাউন্স পায়। পেটপাতলা লোক তো ওখানে কাজ পাবে না! তাহলে তো সব কোশ্চেন আউট হয়ে যাবে।

আপনার শালা স্যার পুজোর সময় বাড়ি আসে না?

আসে। শুধু অষ্টমীর দিনটা থাকে। নবমীর দুপুরে আবার ফিরে যায়। জেলখানার ঘাটে স্পিডবোট বাঁধা থাকে। ঢেউয়ের মাথা ভাঙতে ভাঙতে ছুটে যায়।

সেই সময় যদি কোশ্চেন লিক করে দেয়।

সে উপায় নেই আর!

রহস্যে চোবানো কুমুদস্যারের হাসি দেখে ওরা পাঁচজনই ঘাবড়ে যাচ্ছিল। স্যার অভয় দিয়ে বললেন, এমন কিছু না। এস এস এগজামিনেশনের আইন আলাদা। ডাঙার নিয়মকানুন সেখানে

খাটবে না। ও জাহাজে চাকরি নিয়ে জয়েন করার তিনমাসের ভেতর একটি অপারেশন করাতেই হবে। ক্যাপটেনের অর্ডার। নইলে চাকরি থাকবে না। ক্যাপটেন নিজেও করিয়েছে।

কিসের অপারেশন স্যার ?

কোশ্চেন লিক বন্ধ করতে জাহাজের সবাইকে এক মাস হাসপাতালে থাকতে হয়। জিভ কেটে দেওয়া হয়। সেজন্যে টাঙ্ অ্যালাউন্স্ মাসে দেড়শো টাকা। সারাজীবন পেয়ে যাবে। রিটায়ারের পরেও।

আজই সকালে এসব কথা হয়েছে স্যারের সঙ্গে। 'ওরা পাঁচজনে গিয়েছিল। সঙ্গে ঈগলের ম্যাপ বই। আর ইন্স্ট্রুমেণ্ট বক্সের কম্পাস। স্যার লাল পেনসিল দিয়ে বঙ্গোপসাগরের ভেতর দেড় ইঞ্চি লম্বা একটা লাইন টেনে দিয়ে বলেছেন—এখন মাসের শেষ। 'এস এস একজামিনেশন' সংক্রান্তি পর্যন্ত ওখানে ঘাপটি মেরে থাকবে আর কোশ্চেন ছাপবে। এই হল গিয়ে সুবর্ণ সুযোগ। অভিরামের দিদির চিঠিতে সবকথা আমি সংকেতে জানিয়েছি।

চিঠি যায় ওখানে ?

হেলিকপ্টার ছোঁ মেরে চিঠি ফেলে আসে। চিঠি তুলে আনে।

তুলে আনে কি করে ?

খুব সিম্পিল। জাহাজের মাস্তুলের ডগায় বাহাত্তর জন ক্রুর চিঠিপত্র একটা বাণ্ডিল করে তুলে দেওয়া হল। হেলিকপ্টারের পাইলট চক্কর মেরে একসময় জানলা দিয়ে বাঁ হাত গলিয়ে চিঠির বাণ্ডিলটা তুলে নেয়।

পবিত্র বলল, কি সংকেত জানালেন স্যার ? অভিরাম মামা বুঝতে পারবে তো ?

না বোঝার কোন কারণ নেই। পাঁচটি কচ্ছপ ভেসে উঠবে। ওদের কিছু ঘাস খেতে দিও।

সবাই অবাক হয়ে কুমুদস্যারের মুখের দিকে তাকালো। আশ্চর্য বুদ্ধি স্যারের। নৃপেন বলল, কচ্ছপ মানে আমরা! আমরা ভেসে উঠবো আর ঘাস খেতে দেবে। তার মানে কোশ্চেনের প্যাকেটটা নিচে ফেলে দেবে।

স্যারকে নগদ দু'শো টাকা গুণে দিয়ে ওরা বেরিয়ে এসেছিল। বেরোবার সময় হায়দার বলল, আজ সারা শহর টের পাবে। কোন রাস্তায় আলো নেই।

ওরা শেষ রাত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে চারশো সত্তরটা লাইট পোস্টের ডুম খুলেছে। শুধু পুলিশ লাইনের ডুমগুলো খোলা হয়নি। সতেরোটা চাপাকলের মুখ খুলেছে। দু'শো টাকা কি কম!

দুপুরটা গেছে হনুমানদার ডেরায়। তার মতে, এই হল গিয়ে সুবর্ণসময়। হয় এখন—নয়তো কখনোই নয়। এসপার নয়তো ওসপার! এখন চাই শুধু একটা লঞ্চ।

ম্যাপ, সংকেতে চিঠি—সব হয়ে গেছে। এখন শুধু স্যারের দাগ দেওয়া লাল লাইনটার মাথায় গিয়ে পৌঁছতে হবে। সঙ্গে আছে শালাকে লেখা স্যারের পার্সোনাল কনফিডেনসিয়াল লেটার। গঁদের আঠায় আটকানো।

মহাবুবদা উৎসাহভরে দেখাতে দেখাতে বলল, কেন? তোরা কি লঞ্চে চাকরি নিবি নাকি। এ হল গিয়ে বাগচি কোমপানির লঞ্চ। হাত ভাল সেট না হলে চালাতেই দেবে না। আমিই এস এস মাগুরা চালাচ্ছি আজ তেরবছর। সন্ধ্যের দিকে আসিস। দরগায় সিন্নি দিতে যাব আমরা সবাই—

সিন্নি কিসের মহাবুবদা?

সেই যে বলেছিলাম—তুফানে পড়ে হাবিশ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। তাই বাবুসাহেবের দরগায় সিন্নি মেগেছিলাম। সিন্নি দিয়ে ফেরার পথে মোরগ কিনবো। কাটবো। রাঁধবো। খাবি

তো আসিস তোরা। দাওয়াত রইলো। তারপর রাত ন'টায় বাঁশী দিয়ে লঞ্চ ছাড়বো।

নিশ্চয়ই আসবো। বলতে বলতে নৃপেন আসফাকুলকে চোখ টিপলো।

সন্ধ্যে সাতটা না বাজতেই শহরের রাস্তায় রাস্তায় গোলমাল বেধে গেল। রিক্সা সাইকেলের সঙ্গে গরুর গাড়ির লেজের ধাক্কা, কেউ বা ড্রেনে পড়ে গেল—কেউ বা কারও ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। সারা শহরের রাস্তাঘাট অন্ধকার। তার ভেতর সতেরোটা চাপাকলের মুখখোলা। ডাকবাংলোর মোড় অন্ধকারে জলে ভেসে যেতে লাগল। তাতে পা হড়কে পড়লো তিনজন। তার ভেতর মিউনিসিপ্যাল কাউনসিলের বিরোধীদলের নেতা অঘোরবাবু একজন।

সবাই যখন মিউনিসিপ্যালিটির মুণ্ডুপাত করছে তখন তেইশজন মাল্লা নিয়ে মহাবুবদা বাবুসাহেবের দরগায়। মাথায় রুমাল বেঁধে বাবুসাহেবের দরগাহের সামনে হাঁটুগেড়ে বসে প্রার্থনা করছে। সেখান থেকে দুই সারি বাড়ি আর গার্লস স্কুল পেরোলেই ভৈরব নদী। বাবুসাহেব বড় জাগ্রত দরগা। যা চাওয়া যায় তাই ঘটে। মহাবুবদা 'ফ্লোরিকান' স্টিমারের ক্যাপটেনের দেমাক সহ্য করতে পারে না। মনে মনে বলছিল, দাও বড় সারেংয়ের স্টিমারের বয়লার ফাটিয়ে। তাহলে বেশ কিছু প্যাসেঞ্জার মাগুরা অব্দি তার লঞ্চে যাবে। টিকিট পিছু টাকায় তিন পয়সা কমিশন। মোনাজাতের ঠিক এই সময় একটা ভোঁ শুনতে পেল মহাবুব। শুধু সে শোনে নি। বাকি তেইশজন মাল্লাও শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার ভোঁ বেজে উঠলো।

মহাবুব দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, এ তো মাগুরার ভোঁ।

তারপর। তারপর তেইশজনকে নিয়ে দৌড় দৌড়। পড়ি কি মরি করে—

মাত্র একজনকে বয়লারে রেখে ওরা এখানে এসেছিল। আর খানিক পরেই প্যাসেঞ্জাররা এসে ডেকে বিছানা পেতে শোবে।

লঞ্চঘাটায় পৌঁছে সবাই দেখলো বয়লার খালাশি হরিশ্চন্দ্র নদীর পাড়ে ফাঁকা গুমটিঘরে পড়ে গোঙাচ্ছে। হাত পা বাঁধা। মুখের ভেতর গামছা গোঁজা। এস এস মাগুরা লেজে লাল আলো জ্বেলে সামনের সার্চলাইট ফেলে জল কাটতে কাটতে রূপসার দিকে বাঁক নিল। নিমেষে মিলিয়েও গেল।

হরিশ্চন্দ্রর বাঁধন কেটে দিতেই মুখ থেকে নিজে গামছা বের করে হাউমাউকাউ করে কেঁদে উঠলো। মহাবুব সারেং কিছু না বলে ঠাস করে এক চড় কষালো তার গালে। না কেঁদে কি হয়েছিল বল।

এক চড়ে হরিশ্চন্দ্র গুম খেয়ে গেল। আর কথা বলে না। মহামুস্কিল। মহাবুব দেখলো হাতে আর সময় নেই। কঁ্যাক করে হরিশ্চন্দ্রের পেটে একটা কোৎকা দিল।

উক্! বলে আওয়াজ করেই হরিশ্চন্দ্র বলতে লাগল, দাদাবাবুরা যেমন আসে তেমন এসে বলল, বয়লার কয়লা খায় কোত্থেকে? ছাখাও তো। আমিও বয়লারের দরজা খুলে দেখাতে যাব—অমনি পেছন থেকে হুমদো মত একটা লোক এসে আমার চোখ বেঁধে ফেলল গামছায়।

হুমদো বুঝলে কি করে?

মোটা মোটা আঙুল। পেছন দিক থেকে বড় শরীর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা—

একটা বড় সাইজের মানুষ? কে হতে পারে? বলতে বলতে মহাবুব চুপ করে গেল। তারপর জানতে চাইল, ক'দিনের কয়লা লঞ্চে আছে?

তা দশ বারো দিনের।

হুঁ। লঞ্চ নিয়ে কোথায় যেতে পারে? এমন মতিচ্ছন্ন কেন

হল ওদের? সঙ্গেই বা লোকটা কে? তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বলল, চল যাই জলপুলিশের আখড়ায়—

লঞ্চঘাটার রাস্তায় মহাবুব আর তার চব্বিশজন মাল্লা মাথা হেঁট করে হাঁটছিল। ফ্লোরিকান স্টিমারের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওদের মাথা যেন মাটিতে মিশে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়েই ফ্লোরিকানের বড় সারেং সার্চলাইট জ্বেলে দিল। মহাবুবের মাথা আরও নুয়ে পড়ল।

স্টিমারে লঞ্চে আলো থাকলেও নদীর ঘাটের রাস্তায় আলো নেই। টিকিট কাটতে এসে প্যাসেঞ্জারদের হয়রানির একশেষ। ঘেষের রাস্তা। তা আবার জলে প্যাচ প্যাচ করছিল। তার ভেতর দিয়েই মহাবুব সারেং গিয়ে হাজির হল জলপুলিশের দফতরে।

ওদিকে তখন পুরো স্টিম নিয়ে এস এস মাগুরা জল কেটে চলেছে। হনুমানদা ডেকে, ইঞ্জিন ঘরে, সারেংয়ের কাঁচে ঢাকা ঘরে —সবজায়গায় যত আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। হায়দার একটা রেডিও পেয়ে কাঁটা ঘোরাচ্ছিল। এমন সময় রেডিও গাঁক গাঁক করে বলতে শুরু করে দিল—

আকাশবাণী কলকাতা—

স্থানীয় সংবাদ পড়ছি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—

আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হল—

তারপরেই রেডিওটা খানিক কাশলো—তারপর পরিষ্কার গলা ভেসে এল—

ভৈরব নদীর ওপর থেকে 'এস এস মাগুরা' লঞ্চটি আজ সন্ধ্যায় কে বা কারা ছিনতাই করে নিয়ে রূপসা নদী দিয়ে চলে গিয়েছে। খবরে প্রকাশ, পাঁচজন কিশোর একজন বয়স্ক লোকের নেতৃত্বে একাজ করেছে। লঞ্চের সারেং ক্যাপ্টেন মহাবুব আলম জলপুলিশে এজাহার দিয়েছেন—

লঞ্চের ছাদে বসেছিল হনুমানদা। হায়দারকে সেখান থেকেই ধমক দিল। নে রেডিওটা এবার বন্ধ কর। সামনে যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। অচিন্ত্য আর আসফাকুলকে আরও কয়লা দিতে বল বয়লারে—

হায়দার বয়লার ঘরে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। অচিন্ত্য হাঁফাচ্ছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হাতে বেলচা। কয়লার গুঁড়ো উড়ে এসে গায়ের ঘামের সঙ্গে মিশে চেহারাখানা মিশমিশে কালো করে দিয়েছে। তাতে বয়লারের খোলা দরজা দিয়ে লালচে আলো এসে পড়ায় অচিন্ত্যকে একদম অন্যরকম লাগছিল।

হায়দার এগিয়ে এসে ওর হাত থেকে বেলচাটা নিল। তুই একটু রেষ্ট নে। আমি ততক্ষণ দিতে থাকি।

আসফাকুল বয়লার ঘরের দরজায় লাগানো কাচের দু'টো নলের দিকে তাকিয়ে ছিল। মহাবুবদার শেখানো বিদ্যায় ও তখন স্টিমের মাত্রা মাপছিল। কতটা জল—কতটা ধোঁয়া নলের ভেতর থাকলে তবে লঞ্চের চাকা ভালভাবে জল কাটবে—এটা শিখিয়েছিল মহাবুবদা স্বয়ং।

নৃপেন আর পবিত্র ছুটতে ছুটতে এল। নৃপেন বলল, খাবার ঘরে দেখলাম—প্রচুর মাংস রান্না করা আছে। তিন ডেগ ভাত—আর অন্তত দশডজন ডিম তোলা রয়েছে তাকে।

পবিত্র বলল, আমরা কোশ্চেন নিয়ে ফেরার পথেও অ-অ-অত খাবার খেয়ে শেষ করতে পারব না।

কয়লা দে বয়লারে। সারা গায়ে ঘাম দিয়ে খিদে পেয়ে যাবে।

অচিন্ত্য বলল, এতক্ষণে সারা শহর তোলপাড় হলো। একে আলো নেই রাস্তায়। তারপর 'এস এস মাগুরা' জলপথে লোপাট!

হায়দার বলল, রাত দশটায় স্থানীয় সংবাদে আমাদের কথা বলল।

রেডিও জেনে ফেলেছে! কেলেঙ্কারি। একটু থেমে নৃপেন বলল, বাবা তো রেডিও শোনে রোজ। নাম বলেছে?

উঁহু। বলেছে—পাঁচজন কিশোর একজন বয়স্ক লোকের নেতৃত্বে—

হনুমানদার কথা জানলো কোত্থেকে?

ওই ব্যাটা হরিশ্চন্দ্র গিয়ে বলে দিয়েছে নিশ্চয়।

তাহলে তো আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে নিশ্চয়।

আসফাকুল বলল, নদী একটা বিরাট জায়গা। এখানে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

নৃপেনের মাথায় ব্লেকের বুদ্ধি এসে ঢুকলো। বলল, এখন তো রাতের বেলা। সারা রাত চলে ভোর ভোর গিয়ে সমুদ্রের কোন খাড়িতে ঘাপটি মেরে থাকবো। আবার সন্ধ্যে সন্ধ্যে অন্ধকারে স্টার্ট নেব।

সন্ধ্যায় অন্ধকারে স্পিডের মাথায় ভেসে বেড়াতে ভালোই লাগছিল। সামনে সার্চলাইটের আলোয় ঢেউগুলো ভেঙে পড়ছে। তার সাদা ফেনা অজস্র বরফকুচি হয়ে নিমেষে মিলিয়ে যাচ্ছিল। হনুমানদা বলল, এবার তো কোথাও ভেড়ানো দরকার। লঞ্চের ঘড়ি বলছে, এখন পৌনে ন'টা। তার মানে আমরা প্রায় দু'ঘণ্টা ভেসে বেড়াচ্ছি।

আরও চলুক না হনুমানদা।

নারে নৃপেন। এখন অনেক নদী পড়ছে। কোনটা দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ব বুঝতে পারছি না।

কেন? আমরা তো রূপসায় আছি। তারপর সিপসা। সিপসা গিয়ে বঙ্গোপসাগরে—

আমিও তো তাই ভেবেছিলাম। এখন দেখছি খানিক যেতেই তিন চারটে করে নদী এসে পড়ছে। কোনটা ধরে এগোবো বুঝতে পারছি না। নদীর তো কোন সাইনবোর্ড কিংবা নেমপ্লেট নেই। আমরা যে ভুল নদীতে ঢুকে পড়িনি—কে বলতে পারে।

আসফাকুল, পবিত্র, হায়দার, অচিন্ত্য এসে নোঙরের কাছে দাঁড়িয়ে। আসফাকুল বলল, তাতেই বা ভয় কি। কাল দিনের বেলা পথ চিনে নেওয়া যাবে। এখন তো চলুক।

আমার কোন আপত্তি নেই। তবে কিনা কোন চড়ায় গিয়ে যদি আটকায় তখন চাই কি লঞ্চের খোল ফেটে জল ঢুকতে পারে—

অ-অ-অলুক্ষণে কথা কেন বলছো হনুমানদা। আ-আলো জ্বেলে রাস্তার মাঝখান থেকে চালাও না। তাহলেই গুতো খাবে না। তারপর কা-কাল সকালে দিনে দিনে ভা-ভাবা যাবে।

অচিন্ত্য পবিত্রকে ভেঙিয়ে বলল, সে-সে-সেই ভালো।

হনুমানদারও অনেকদিন পরে বেশ ভালোই লাগছিল।

এ'কমাস শুধু মশার কামড় খেয়ে খালিশপুরের জঙ্গলে কেটেছে। এখানে কেমন নদীর খোলা হাওয়া। একটা মশাও নেই।

খানিক পরে ওরা যখন খেতে বসল—তখন হনুমানদা কিসব টানাটানি করে ইঞ্জিনটা বন্ধ করল। ইঞ্জিনের বুকে লোহা খোদাই করে লেখা: লিস্টার। ৩০ এইচ পি। তার নিচে ইংরাজিতে লেখা 'লক্ষ্মীকান্ত।'

ইঞ্জিনেরও যে একটা নাম থাকে তা ওরা এই প্রথম জানলো। বন্ধ ইঞ্জিনের লঞ্চ অল্প অল্প ভাসছিল। দুলছিলও বটে। খেতে বসলে আসফাকুল সবাইকে খাবার এগিয়ে দিচ্ছিল। হনুমানদা খেতে খেতে উঠে গিয়ে একবার হালের মাথার ওপরের দড়ি টেনে ভো বাজালো। বাজিয়ে তো দিই। উল্টোদিকের কোন স্টিমার আলো ফেলেও যদি এগিয়ে আসে—তাহলেভো শুনে থেমে যাবে। কলিশন হবে না।

কয়লার ধুলো মাখা গায়েই হায়দার আর অচিন্ত্য খেতে বসেছে। নদীর হাওয়ায় খিদেটা যেন আরও চারিয়ে গেল। এক একজন তিন চারটে করে ডিম খেল। হায়দার তার ওপর দু'প্লেট মাংস।

খাওয়া দাওয়ার পর হনুমানদা বলল, আমাদের এখন তিনটে জিনিস বাঁচিয়ে চলতে হবে। সবাই তাকিয়ে আছে দেখে হনুমানদা বলল, সে তিনটে হল: কয়লা, খাবার জল আর মাংস-ডিম-ডাল ভাত-নুন-মশল্লা। কতদিন বড়জলে থাকতে হবে বলা যায় না। কোন জিনিস ফুরোলেই চিত্তির। বিশেষ করে কয়লা—

ক-কয়লা তো আমরা খাইনে—

বয়লার কয়লা খায়। ডাল ফুরোলে, জল ফুরোলে মটকা মেরে পড়ে থেকে তীরে এসে খাওয়া যায়। কিন্তু কয়লা ফুরোলে তীরেও ফেরা যাবে না। ভেসে বেড়াতে হবে। ঢেউ তাড়া করে এলে পাশ কাটানোও যাবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডুবতে হবে।

এটো হাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে পবিত্র বলল, কয়লার এত গুণ !

হাত ধুয়ে এসে বয়লারে একটু কয়লা দিবি চল। এখন বসে থাকার সময় নয়।

সবাইকেই উঠতে হল। নিচে বয়লারে যাবার সময় ওরা পাঁচজনই লঞ্চটাকে আতিপাতি করে দেখতে লাগল। কত যে ঘুপচি খুপরি এখানে সেখানে তার ইয়ত্তা নেই। কোণে কোথাও সামান্য জায়গা পড়ে ছিল। সেখানেও কেরোসিন বোঝাই টিন রয়েছে। কোথাও বা চাল। এক জায়গায় তো একটা বায়নাকুলার পেয়ে গেল। কিন্তু দিনের বেলা নাহলে তো কিছু দেখা যাবে না।

তারপর ভরপেটে ওরা পাঁচজনে হাত বদলাবদলি করে বেলচা ভর্তি কয়লা পাঠাতে লাগল বয়লারে। একটা লোক উবু হয়ে ঢুকে যেতে পারে এমন একটা গর্তের ভেতর দিয়ে কয়লা ছুটে গিয়ে বয়লারের পেটে পড়ছিল। পেট বলতে জায়গাটায় শুধুই আগুন। খানিক নীল। খানিক লাল রঙের। আর কি গরম। একদণ্ড দাঁড়ানো যাচ্ছিল না।

আসফাকুল বয়লারের দরজাটা আটকে দিয়ে বলল, পুরো স্টিম হয়ে গেছে। দেখছিস না—ধোঁয়া-মিটারে জলের চেয়ে ধোঁয়া বেশী হয়ে যাচ্ছে।

ওরা দেওয়ালে লাগানো দু'টো কাঁচের পাইপে তাকিয়ে দেখল, জল নিচে নেমে পড়েছে। পাইপের অর্ধেকের বেশি জায়গা জুড়ে ধোঁয়া। সত্যিই তো। কি করে শিখলি ?

মহবুবদা দেখিয়েছিল। বলতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল আসফাকুল।

হায়দার বলল, লোকটা এখন পথে পথে ঘুরছে। বাবুসাহেবের দরগা থেকে ফিরে তো সব দেখেশুনে আক্কেলগুড়ুম হয়েছে।

পবিত্র বলল, লোকটা কিন্তু ভাল। আমাদের জন্যে এখন—

অচিন্ত্য বাধা দিয়ে বলল, সাধাসাধি করলেও কি মহবুবদা এ লঞ্চে করে আমাদের এস এস এগজামিনেশনে নিয়ে যেত। পায়ে ধরলেও নিত না। বলত, মাগুরা লাইনের লঞ্চ। কি করে বেপথে যাব? অথচ—

হায়দার বলল, বঙ্গোপসাগরে আমাদের যেতেই হবে।

আসফাকুল বলল, সেখানে কোশ্চেন ছাপা হচ্ছে।

পবিত্র বলল, সেই কোশ্চেন আউট করে আমরা সবাই ফার্স্ট সেকেণ্ড হব।

তা না হলে কণাকে পাবে কি করে নৃপেন।

সবার শেষে অচিন্ত্যর এই কথায় নৃপেনের মাথাটা নুয়ে গেল। পাটাতনের দিকে তাকিয়ে বলল,-আমার জন্যে সবাই কষ্ট পাচ্ছিস তোরা।

হায়দার বলল, না। না। আমিও তো ফাঁকতালে ফার্স্ট থেকে ফিফতের মধ্যে স্ট্যাণ্ড করে ক্লাশ প্রোমোশন পাব।

নৃপেন তবু মাথা তুলে তাকাতে পারছিল না। আস্তে বলল, কিন্তু মহবুবদার কথাটা একবার ভাবতো। কত বিশ্বাস করে আমাদের লঞ্চ দেখিয়েছিল। এখন?

অচিন্ত্য বলল, কণার জন্যে তুই এখন যা ইচ্ছে করতে পারিস। তাতে কোন পাপ নেই। লাভে পড়ে মানুষ কত কি করে। খুন জখম। এতো কোন্ ছার। কোশ্চেন নিয়ে ফিরে এসে মহবুবদার পা জড়িয়ে ধরে বলব—এবারটির মত মাপ কর। তারপর সবাই গিয়ে বাবুসাহেবের দরগায় মোরগ দিয়ে কুমুদস্যারের ডিক্টেশন নেব।

বেশি রাতে চাঁদ উঠলো। মাল্লাদের বিছানা পেতেই ওরা শুয়ে পড়ল। হনুমানদা স্টিয়ারিংয়ে। আজ রাতে তার আর শোয়া হবে না।

আসফাকুল দু'দুবার শুতে বলল। তুমি এসে একটু শুয়ে নাও; বাকি রাতটুকু আমি দেখছি।

তা হয় নারে। তোরা এখনো ছোট আছিস। কি দেখতে কি দেখে ইঞ্জিন চালিয়ে বসবি। শেষে কোন্ চড়ায় গিয়ে ঠেকে যাব। এই ভালো। তোরা এখন শুয়ে থাক। আমিও হালে মাথা রেখে একটু একটু ঘুমিয়ে নেব।

হাল মানে—একটা গোল লোহার চাকা। ঠিক মোটর গাড়ির স্টিয়ারিংয়ের মতই। পার্থক্য শুধু—সেই চাকার গা থেকে কয়েক খানা লোহার ছোট রড বেরিয়ে গিয়েছে। সেই জায়গাগুলো চেপে ধরেই চাকা ঘোরাতে হয়।

এখন আর তত আলো নেই। শুধু ডেকের বড় ডুমটা জ্বলছিল। পাশাপাশি পাঁচজন শুয়ে। লঞ্চে অঢেল বিছানা। নৃপেন আর আসফাকুল উপুড় হয়ে শুয়েছিল। বাকি তিনজন চিৎ। পায়ের দিকে সারেং ঘরে মহবুবদার উঁচু টুলে হনুমানদা স্টিয়ারিংয়ে মাথা দিয়ে ঝিমোচ্ছিল। তার ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। পায়ের দিকের ছোট ডুমটার চাপা আলো ওদের গায়ে এসে পড়েছে।

নৃপেন বলল, বাবা নিশ্চয় এতক্ষণে জানতে পেরেছে। না শুনলেও রাত দশটার খবরে ঠিক শুনে নেবে।

ফাঁকা মাঠে আর নদীতে সকাল হয় সবচেয়ে সকালে। গাঙচিলের দল পাক খেয়ে খেয়ে ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ছিল। একটা থমথমে লাল আগুনের দলা হয়ে সূর্য দেখা দিল। ইঞ্জিনের ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গিয়ে ওরা পাঁচজনই প্রথমে এই ছবিটা দেখল।

তখন শুনতে পেল, উঁচু টুল থেকে হনুমানদা বলছে, আসফাকুল তুই আগে চা বসিয়ে দে। নিশ্চয় কোথাও চা চিনি আছে এখানে। শুধু ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে।

আজ নদীতে প্রথম সকাল। লঞ্চ থেকে তীর বেশ দূরে। গাঁ আছে নিশ্চয়। নারকেল খেঁজুরের আড়ালে টিনের চাল চোখে

পড়ল। সে-চালে আবার একটা মুরগি পণ্ডিতী ঢংয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

গাঙচিলের দলটা পাক খেয়ে এসে আবার নোঙরের কাছে বসল। কেউ কেউ গোটানো শেকলের ওপর।

সারারাতে অনেকটা বোধহয় ভেসে এসেছি আমরা। কিছুই যে চেনা লাগছে না। ও নেপেন—

আমিও তো চিনিনা হনুমানদা।

তোদের কিছু চেনা লাগে?

সবাই মাথা নাড়ল। শুধু পবিত্র বলল, জায়গাটা বা-বার্মা নয়তো? ছাখ নদীর বাঁকের জায়গাটা ম্যাপের বা-বার্মার মত বেঁ-বেঁকে গেছে।

নারে। একরাতে এতটা আসা যায় না। তীরের দিকে যাবি?

খুব কাছে গেলে ধরে ফেলতে পারে। লঞ্চের সারেং, মাল্লা কি কখনো নদীতে পথ হারায়? তীরে উঠে জানতে চাইলেই সন্দেহ করবে।

খুব খাঁটি বলেছিস আসফাকুল। হনুমানদা 'লক্ষ্মীকান্তকেও' ঘুম থেকে জাগালো। লঞ্চ নড়ে চড়ে এগোতে লাগল। নদীটা বেশ বড়। কচুরিপানার ঝাঁক ভেসে ভেসে আসছে। বড় দুটো বজরা কাঠ বোঝাই দিয়ে দূরে দূরে ভেসে যাচ্ছিল।

চা খেয়ে হনুমানদা বলল, তোরা সবাই লঞ্চের দু'দিকের নেমপ্লেট খুলে নিয়ে আয়। নইলে মাঝিরা ঠিক চিনে ফেলবে।

ঠিক তো। এখন দিনের বেলা।

ওরা পাঁচজনে 'এস এস মাগুরা' লেখা দ'খানা সাইনবোর্ড খুলে নিয়ে এল। নৃপেন নিয়ে এল ইনস্ট্রুমেন্ট বক্সের কম্পাস আর ম্যাপ বইখানা। কুমুদগ্যারের লাল দাগ দেওয়া লাইনটা দেখিয়ে হনুমানদাকে বলল, ওখানে গিয়ে পৌছলেই কোশ্চেন ছাপার

জাহাজের সঙ্গে দেখা হবে। তারপর তো স্যারের কনফিডেনসিয়াল লেটার আছেই।

হনুমানদা বলল, এ লাল দাগের গোড়া কোথায় ?

মানে ?

কোন জায়গা থেকে এ দাগের শুরু ধরতে হবে ?

ভৈরব নদীর লঞ্চঘাটা থেকে।

তাহলে সারা রাত ভেসে এখন আমরা কোথায় ?

মাইল মিটার আছে না—

আছে তো। কিন্তু এ দেখছি কিলোমিটরে লেখা। লঞ্চ চলেছে —৩৭৫৫২ কিলোমিটার।

হনুমানদা থেমে বলল, কিলোমিটার নয়। কী একটা নতুন কথা লেখা।

হায়দার বলল, জলের মাইল অন্যরকম। সে রকম কিছু একটা হবে। কিন্তু লঞ্চঘাটা থেকে একরাতে তো আমরা এতটা আসতে পারিনা—

একবারের নয়রে। এ হল গিয়ে লঞ্চ সবশুদ্ধ কতটা চলেছে তার হিসেব। এর থেকে বের করতে হবে—আমরা একরাতে কতটা এসেছি।

পবিত্র তখন মহবুবদার খাতাপত্র হাটকাচ্ছিল। গাঙচিলের দলটা আবার উড়ে গেল। পবিত্র একখানা খাতা খুলে চেঁচিয়ে উঠল। ইউরেকা! ইউরেকা !! পেয়ে গেছি। পেয়ে গেছি। হ-হ -হনুমানদা।

কি পেয়েছিস ? বল না!

এই তো ত্যাখো মহবুবদার লগবুক। কাল পর্যন্ত লঞ্চ কত চলেছে—তার হিসেব লেখা রয়েছে। ৩৭৪৯১। তাহলে বিয়োগ করলেই পেয়ে যাবে। এক-এক একষট্টি।

সত্যিতো। আর তুই কিনা অঙ্কে পাস শূন্য।

সে-সেই দুঃ-দুঃ-দুঃখেই তো আমাদের এই সমুদ্রযাত্রা।

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। সকালবেলার নদীতে গাঙচিল ছোঁ মেরে ঠোঁটে মাছ লটকেই আকাশে উঠে যাচ্ছে।

নৃপেন বলল, জলের ৬১ মাইল পার হয়ে এসেছি আমরা। এবার হনুমানদা তুমি ম্যাপের লাল দাগ দেখে এগোও।

আমি তো কোনদিন বিশেষ পড়াশুনো করিনি। যা কিছু জানি দেখে দেখে। আমি কি করে বলব। ম্যাপের লেখাপত্তর তো আমি বুঝিনে।

হায়দারের হাতে পড়ে লঞ্চের ট্রানজিস্টরটা কঁকিয়ে উঠলো। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর আবার বলছি। গতরাতে ভৈরবে ছিনতাই লঞ্চের এখনো কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। নদীতে জলপুলিশ—আকাশে বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার 'এস এস মাগুরাকে' তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হনুমানদা স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে বলল, এই সেরেছে! জলপুলিশ ছিল—ছিল। ওদের থাকতেই হয়। এয়ারফোর্সের হেলিকপ্টার আবার কেন?

অচিন্ত্য বলল, আমার কথা যদি সবাই শোনো তবে বলি। এখন আমরা গাছপালায় ঢাকা সরু নদীতে ঢুকে পড়ি। আকাশ থেকে হেলিকপ্টার তাহলে আমাদের কোন খোঁজ পাবে না। বিকেল বিকেল আবার এগোনো যাবে। এই ভাবেই চলতে হবে।

মন্দ বলিসনি। বলে হায়দার ট্রানজিস্টরের কাঁটা ঘোরাতেই আবার গলা ভেসে এল।

হায়দার আলি

অচিন্ত্য ঘোষ

আসফাকুল ইসলাম

নৃপেন্দ্রনাথ দত্তচৌধুরী

পবিত্র গুই

অ্যানাউনসার একটু থেমে আবার বলল—

তোমাদের নামগুলো আবার বলছি। যেখানেই থাকো ভালো করে এই ঘোষণা শুনবে—

হায়দার

অচিন্ত্য

আসফাকুল

নৃপেন্দ্র

পবিত্র

তোমাদের মা বাবা তোমাদের পথ চেয়ে বসে আছেন। তোমাদের হেডস্যার তোমাদের কথা বলছেন। তোমরা যেখানেই থাকো ফিরে এসো। যা করে ফেলেছো ফেলেছো। কোন শাস্তির ভয়ে পালিয়ে থেকো না। এক্ষুণি ফিরে এস। নিজেদের জীবন বিপন্ন কোরো না।

নৃপেন চেঁচিয়ে উঠলো। কণা নিশ্চয় ঘাবড়ে গেছে। ও তো আর জানেনা আমরা কেন বেরিয়ে পড়েছি। তারপর নৃপেন হো হো করে হেসে উঠলো। যখন ফার্স্ট হয়ে বেরোবো—তখন কী মজাটাই হবে দেখিস। সবাই অবাক হয়ে যাবে।

ট্রানজিষ্টর আবার ওদের ডাকতে লাগল।

সবাই জানে তোমরা কোন দুবৃত্তের পাল্লায় পড়ে বিপথচালিত হয়েছো। তোমাদের ওই বয়স্ক বন্ধুটি সম্পর্কে সাবধান। ক্যাপ্টেন মহাবুব আলম তোমাদের জন্য চিন্তিত। তোমরা শীগগিরি ফিরে এস। লঞ্চে আর মাত্র এগারোদিনের কয়লা আছে।

এগারোদিন লাগবে না। কোশ্চেন নিয়ে আমরা তো তিন দিনের ভেতর ফিরে যাচ্ছি। অনেক কয়লা বেঁচে যাবে।

পিঠ বাঁচবে না কিন্তু। ফেরা মাত্র আমাদের আড়ং ধোলাই দেওয়া হবে। একথা মনে রাখিস।

হায়দারের এ-কথায় অচিন্ত্য বলল, রাতে রাতে লঞ্চঘাটায় আমরা ফিরে যাব। নোঙর করে দিয়ে যে যার বাড়ি সটকাবো।

সে তো না হয় জলপুলিশ এড়ালি। মহাবুবদাকে এড়ালি। কিন্তু যার যার বাড়ির প্যাদানি।

নৃপেন বলল, বাঃ! মহৎ কাজে নেমে এইটুকু কষ্ট স্বীকার করতেও তোরা প্রস্তুত নোস্? কঠিন কাজে কষ্ট থাকে। কাজ হয়ে গেলেই তো কেষ্ট!

পবিত্র বলল, এখন এসব কথা থাক ভাই। অমঙ্গলে চিন্তা করে কোন লাভ আছে? আমরা যেন কোনদিন কোথাও ধোলাই খাইনি! রোজ তো ঘুম থেকে উঠে রাতে শুতে যাওয়া অবধি সবার হাতে আমরা ধোলাই খেয়ে আসছি। বাড়িতে বাবার হাতে। স্কুলে স্যারদের হাতে। রাতে দেরি করে বাড়ি ফিরে আবার বা-বা বাবার হাতে।

হনুমানদা সারেং ঘরের পেছনের জানলায় তাকিয়ে বলল, ওই লাল রঙের লঞ্চ আসছে একটা। দূরে—পুলিশের নয়তো। স্টিম আছে তো বয়লারে?

পুরো স্টিম কাল রাত থেকে তৈরি করা আছে হনুমানদা। জোরে চালাও। জোরসে—

একথা বলে আসফাকুল বাকি চারজনকে নিয়ে লঞ্চের পেছন দিকে মেটের কেবিনে গিয়ে দাঁড়াল। সত্যি সত্যি একটা লাল লঞ্চ সকালের রোদে ঝক ঝক করছে। ঢেউ তুলতে তুলতে অনেক দূর থেকে জলের ফেনা ভেঙে এদিকেই যেন এগিয়ে আসছে। নৃপেন ছুটে গেল সারেংঘরে। জোরে চালাও হনুমানদা। নিশ্চয় জল পুলিশের লঞ্চ।

কোনটা টানলে ষ্টার্ট হয় ভুলে গেছি নেপেন। কিছু মাথায় আসছে না।

নৃপেন পেছনে তাকিয়ে দেখলো, লঞ্চটাকে যেন এবার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মরীয়া হয়ে এটা ওটা টানাটানি করতেই নৃপেন দেখল লঞ্চের 'লক্ষ্মীকান্ত' ইঞ্জিন বট বট করে ঝাঁকুনি দিয়ে ষ্টার্ট নিয়েছে।

তক্ষুণি স্টিয়ারিং ধরে ফেলল হনুমানদা। যাক্! মনে পড়েছে। সরে বোস। আমিই চালাচ্ছি। ফুলস্পীডে এস এস মাগুরা ছুটতে লাগল। খানিক পরে ওরা পেছনে তাকিয়ে দেখলো, লাল লঞ্চটা আবার ছোট হয়ে এসেছে। বাঁ হাতে বাঁক নিয়েই হনুমানদা দেখলো নদী থেকে একটা ছোট নদী বেরিয়ে গিয়ে বাঁ হাতের ঝুপসি ঝুপসি ছায়াফেলা বিরাট বিরাট গাছের তলায় হারিয়ে গেছে।

বাঁ দিকে হাল ঘুরিয়ে হনুমানদা মাগুরাকে সেই ছায়া ঢাকা ছোটনদীতে নিয়ে এল। এখন জোয়ার। জল থৈ থৈ করছিল। খুব চওড়া নয় নদীটা। আবার খুব রোগাও নয়। গাব, কাসুন্দি, বয়ড়ার জঙ্গল দু'ধারে। কালো একটা পাখি লঞ্চ দেখে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে নিচু হয়ে উড়ে গেল। লঞ্চের কাছাকাছিই একটা বড় কুমীর জলের সীমা ডিঙিয়ে তীরের মাটিতে শুয়ে ছিল। খাট থেকে গড়ানো খোকা-খুকুর স্টাইলে কুমীরটা এক গড়ানে ঝপাং করে জলে পড়েই মিলিয়ে গেল।

বড় বড় গাছের লতাপাতায় ঢাকা বিশাল বিশাল ডাল নদীটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। তার আড়ালে মাগুরা লুকিয়ে গেল। যাকে আর কি বলা যায় ঘাপটি মেরে বসে থাকল।

জায়গাটায় কোন লোকজন নেই। কোন ঘর বাড়িও নেই। ভোরবেলার আলোয় গাছপালার টাটকা ছায়া। রোদ্দুরটাও টাটকা হনুমানদা কী সব টানাটানি করে 'লক্ষ্মীকান্তকে' থামালো।

সকালেই একদম আগুনের মত খিদে। আসফাকুল মাগুরার রান্নাঘরে গিয়ে আচ ধরালো। তারপর জল গরম হতেই গোটা কুড়ি ডিম সেদ্ধ বসিয়ে দিল। পবিত্র পাশের চুলোয় রান্না মাংসের বড় ডেকচিটা চাপালো।

খেতে বসলে ওরা ডালপালার আড়াল থেকে পরিষ্কার দেখলো, সেই লাল লঞ্চটা ঢেউ কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। রেলিং ধরে

পুলিশের পোশাকে কয়েকজন দাঁড়িয়ে। ধুতি পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর —এমন কয়েকজনও দাঁড়িয়ে। কিন্তু চেনা গেল না কাউকে। লঞ্চটা বেশ জোরেই ছুটে গেল। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আবার কুমীর শিকারে বেরোয়নি তো। হয়ত আবার একটা কুমীরের পেট থেকে মানুষের কঙ্কাল বেরিয়ে আসবে। কঙ্কালের হাতে চুড়ি, গলায় হার। শরীরটা হজম হওয়ার পর কঙ্কালটা পেটের ভেতর পড়ে থাকে।

হনুমানদার সঙ্গে ওরা পাঁচজনই ঘাপটি মেরে লঞ্চের পাটাতনে বসে থাকল। হনুমানদা বলল, আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে। নির্ঘাৎ জলপুলিশ।

খেতে খেতে নৃপেন ম্যাপ খুলে বলল, এই লাল দাগের মাথায় তো যেতে হবেই।

হনুমানদা বলল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়াই ভাল। লাল লঞ্চ এখন উত্তরে এগিয়ে গেছে। আবার কোথাও আড়াল দেখে ঘাপটি মেরে থাকব। তখন দুপুরের রান্না বান্না করে নেওয়া যাবে।

ঘণ্টা চারেক এগিয়ে লক্ষ্মীকান্ত সবে সামান্য গরম হয়েছে— হনুমানদা স্টিয়ারিংয়ের পাশে বসে ম্যাপ খুলে রেখে চারদিক দেখতে দেখতে এগোচ্ছিল—দূরে কূল নেই, গাছপালা নেই—এমন জলের একটা বিরাট মাঠ পড়ে আছে—পবিত্র লাফিয়ে উঠে বলছিল— ওইতো বঙ্গোপসাগর! এইতো!

—এমন সময় আকাশের মাথায় দূর থেকে প্রথমে ডাকঘুড়ি —তারপর হেলিকপটার হয়ে হেলিকপটারটা ফুটে উঠলো।

চারদিকে জল। আশেপাশে ঘাপটি মারার মত কোন খাড়ি বা সরু নদী নেই। মাথার ওপর হেলিকপটার এসে গেল। কড় কড় করে কেঁপে উঠে লক্ষ্মীকান্ত গরম হয়ে উঠলো। মাগুরার ৩০ ঘোড়ার ইঞ্জিন লক্ষ্মীকান্তকে এখন হেলিকপটারের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে।

নৃপেন তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে মেঝের কেবিনের বিছানার নীচে

হাত ঢোকালো। হ্যাঁ। ঠিক আছে। কুমুদস্যারের শালাকে লেখা কনফিডেনশিয়াল চিঠিখানা ঠিকই আছে। একবার বুকের, একবার মাথায় ছুঁইয়ে চিঠিখানা আবার জায়গা মত রাখল। এখন তার সামনে আসফাকুল ওরা থাকলে পরিষ্কার শুনতে পেত, নৃপেন বিড় বিড় করে বলছে—কণা, তোমারই জন্যে। তোমারই জন্যে—

লক্ষ্মীকান্ত কোন দিকে না তাকিয়ে হনুমানদার হাতের চাপে মাগুরাকে নিয়ে সোজা বঙ্গোপসাগরে ঢুকে পড়ল।

অচিন্ত্য আর হায়দার তখন রান্নাঘর থেকে এক ঝুড়ি কয়লা নিয়ে সারেং ঘরের ছাদে উঠে গেছে। সেখান থেকেই ওরা এই বিরাট আকাশ পাখিটার ঘুরন্ত ডানা নিরিখ করে কয়লা ছুঁড়তে লাগল। পাখিটা লঞ্চের মাথায় পাক খাচ্ছিল।

সামনেই সমুদ্র। বেশ খানিকটা দূরে বড় বড় ঢেউগুলো থেতলে গিয়ে শাদা ফেনা চিক চিক করে উঠছে। হায়দারের হাতের টিপ নিখুঁত। হেলিকপটারটা এত নীচে নেমে এল যেন এই বুঝি সারেং ঘরের ছাদের ওপরেই ওদের দুজনকে থেতলে দেবে। ঠিক তখুনি হায়দারের হাতের কয়লা গিয়ে ঠকাং করে হেলিকপটারের ব্লেডে লাগল। অচিন্ত্যর কয়লা লাগলো পাইলটের সামনের কাঁচে। ততক্ষণে পাটাতনে দাঁড়িয়ে নৃপেন, আসফাকুল, পবিত্র হেলিকপটারটাকে লক্ষ্য করে কয়লাবৃষ্টি আরম্ভ করে দিয়েছে। আকাশ পাখিটা এক ঝটকায় আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েই সামনের দিকে ছুটে গেল।

হনুমানদা লক্ষ্মীকান্তের গায়ে হাত বুলিয়ে চুমু দিল। বাঘের বাচ্চা। এ যাত্রা তো একটু দম পাওয়া গেল। কিন্তু ও তো লাল লঞ্চকে খবর দিতে ছুটলো।

আসফাকুলও বলল, লাল লঞ্চটা ফিরে এলে তো দমে কুলোবে না। সমুদ্র তখন মাগুরাকে নিয়ে লোফালুফি আরম্ভ করেছে।

লক্ষ্মীকান্তর মাথা ঠাণ্ডা। সে দিব্যি গুম গুম আওয়াজ করে ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে সমুদ্রের ভেতরে এগিয়ে যেতে লাগল।

নৃপেন বলল, এই ফাঁকে যতটা পার এগিয়ে থাকো। চাই কি কোন জাহাজের দেখা পেলে তার লেজে মাগুরাকে বেধে নেব। তখন আমাদের পায় কে। খুঁজে মর!

হনুমানদার বুকের ভেতরটা একবার কেঁপে উঠলো। তাহলে এর নাম বঙ্গোপসাগর। দূরে দূরে ধোঁয়া ছেড়ে কত বড় বড় জিনিস এই বড় জল পারাপার করছে। ওদের ভো শুনলে মাগুরার মত লঞ্চ তো কেঁপে উঠবে। এক একখানা বড় জিনিস বা যাচ্ছে না। আস্ত একটা সারকাস। এর নাম জাহাজ।

আর ভাসছিল মাছ ধরার নৌকো। সারি সারি লাইন দিয়ে ভাসছিল। ঠিক নৌকো বলা যায় না। ঢাউস ঢাউস। কলে চলছে। বাইরে নাইলনের জালের সঙ্গে কপিকল বাধা। মোটা সুতো দিয়ে। অদ্ভুত দেখতে সব মাছ উঠছিল জালে। এইসব চেহারার মাছ অচিন্ত্য হায়দার ওরা কখনো বাজারে দেখেনি।

সমুদ্রটাও বড় অদ্ভুত। আগাগোড়া নীল রঙের। মাগুরা থেকে শুধু ডানহাতের খানিক দূর থেকে জলের রঙ কালো। বেশ চওড়া করে কেউ বা কালো কারপেট পেতে রেখেছে—একদম যতদূর দেখা যায়—ততদূর।

হনুমানদা ম্যাপের ওপর সেই লাল দাগটাকে ঝুঁকে পড়ে দেখে বলল, দেখেছিস—লাইনটার বাঁ পাশ দিয়ে সমুদ্রের রঙ অন্যরকম ভাবে আঁকা। অনেক বেশি গাঢ়।

নৃপেন বলল, সে তো সমুদ্র ওখানে বেশি গভীর বলে নীলটা গাঢ় করে দিয়েছে। তাইতো ম্যাপ বইয়ের নিয়ম।

কে বলেছে? হনুমানদা যেন রেগে গেছে।

তাইতো শেখায় স্কুলে।

ভুল শেখায়। ভালো করে ছাখ্। এই লাল দাগের গা দিয়ে

সোজা গাঢ় রঙের দাগটা সাগরের ভেতরে চলে গেছে। এবার জলের দিকে তাকা। এই সেই গাঢ় জায়গাটা। এরই মাথার দিকে লাল পেনসিলের দাগটার শেষে 'এস এস এগজামিনেশন' দাঁড়িয়ে থাকার কথা। আমি ওই কালো জলে এবার মাগুরাকে নিয়ে যাব। চল্ লক্ষ্মীকান্ত—

জলের ওই কালো জায়গাটা যত কাছাকাছি ভাবা গিয়েছিল—আসলে তত কাছে নয়। বেশ দূরে। মাগুরা যতই ছোটে—কালো লাইনটাও তত পিছিয়ে যায়। অথচ সবাই লঞ্চের পাটাতনে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছিল—যতদূর চোখ যায়—লাইনটাও ততদূর চওড়া হয়ে সমুদ্রের বিশাল বুকের ওপর পড়ে আছে।

হনুমানদা ও লাইনের ওপর যেও না। আসফাকুল বারণ করল। দেখছো না—একটা পাখিও উড়ছে না ওখানে। একখানা মেছো নৌকোও ওদিকে যায়নি। নিশ্চয় কিছু আছে ওখানটায়।

বাজে ভয় দেখাবি না আসফাকুল। আমি গ্রেট সাদার্ন বেঙ্গল সার্কাসের জোকার ছিলাম। এক রাতে আন্দাজে লঞ্চ চালাতে শিখলাম। আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি—ওই কালো দাগ ধরে এগোলেই সোজা কোশ্চেন ছাপার জাহাজে গিয়ে ভিড়বো। দেখে নিস তুই।

নৃপেন বলল, কিন্তু হনুমানদা। একটা লঞ্চও তো ওদিকে যাচ্ছে না। একটা পাখি কেন ওখানে উড়বে না? মাছ ধরতে ডুব দেবে না। দ্যাখো এদিকটায়—কত পাখি উড়ছে। ডুবছে। মাছ তুলে আবার ভেসে উঠছে। ওখানটায় নিশ্চয় কিছু আছে। তুমি দেখে নিও।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক চলে তবে জলের ওপরের সেই কালো পথটাকে এবার কাছে পাওয়া গেল। তবে খুব কাছে নয়। দূর থেকে যাকে কালো লাগছিল—তা আসলে গভীর নীল। রোদ পড়ে অমন দেখাচ্ছিল। ভীষণ চওড়া আর উজ্জ্বল। সাগরের

দু'পাশের জলের চেয়ে একদম ভিন্ন। মাগুরাকে টানতে টানতে লক্ষ্মীকান্ত যতই এগোচ্ছিল—ততই সে জলের আসল চেহারাটা ফুটে উঠছিল।

হনুমানদা লক্ষ্মীকান্তকে সামলাতে সামলাতে বলল, সারা পৃথিবীর গা ধোয়া জল। একদম নুন। মুখে দিসনে কেউ।

হায়দার পাটাতনের কিনারে শুয়ে পড়ে এক আঁজলা তুলেছিল। ফেনা সুদ্ধ। হনুমানদার কথা শুনে ফেলে দিল। চওড়া গাঢ় নীল জলের ভেতর থেকে এবার পরিষ্কার আওয়াজ উঠে আসার শব্দ পেল ওরা। হাজারটা হাতিকে কে বা কারা লোহার মোটা শেকল দিয়ে বেধে রেখেছে। আর এক হাজার হাতি একসঙ্গে সেই শেকল ছিঁড়ে ফেলার জন্যে সামনের পা তুলে বনের ডাক ডাকতে শুরু করেছে। একসঙ্গে হাজার হাতির বৃংহতি। সেই সঙ্গে দাপটের বাতাস। মাথার চুলের গোড়া খুবলে বয়ে যাচ্ছিল।

হনুমানদা কী ভেবে লক্ষ্মীকান্তকে একদম থামিয়ে ফেলল। থামানো কী যায়। কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে হাল ঘুরিয়ে ফেলল হনুমানদা। আর এক ফার্লং এগোলেই সেই জল। ভাল বুঝছি নারে নেপেন। একদম বুনো জল। যা ইচ্ছে করে দিতে পারে।

ওরা পাঁচজনও এই দৃশ্য দেখে একসঙ্গে থমকে গেছে। মাগুরার ঘড়িতে বেলা পৌনে বারোটা। কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছিল না। সারেং ঘরের টেবিল থেকে ম্যাপ বইখানা উড়ে এসে পাটাতনে পড়তেই নৃপেন পা দিয়ে চেপে ধরল। কিন্তু। কিন্তু হনুমানদা। আমরা যে তাহলে ফার্স্ট হতে পারব না।

এমন সময় হেলিকপটারখানা আবার আকাশে ভেসে উঠলো। কয়েক মিনিটের ভেতর প্রায় ছোঁ মেরেই হেলিকপটারটা সামনের আকাশে এসে ভাসতে লাগল। মাথার ওপরের ব্লেড বাই বাই করে ঘুরছিল। পাইলটের পাশে যে লোকটা বসে তাকে তো চেনা চেনা লাগছে।

আসফাকুল চেঁচিয়ে উঠল। নৃপেন তোর শ্বশুর। কোটের ওপর ঘাড়ে চাদর।

নৃপেন চমকে গেল। কণার বাবা?

হায়দার বলল, দেবেশ্বর বাবু?

অচিন্ত্য ঢোক গিললো, হেড়ু?

পবিত্রর তোতলামি একটু বাড়লো, আ-আ-আবার প্যাদাবে। হাতে বেত আছে কি না গ্যাখতো?

সারেং ঘরে বসে হনুমানদা এসবের কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু ওদের কথা শুনতে শুনতেই বলল, এবার দেখবি সেই লাল লঞ্চটা আসবে। খবর পেয়েছে তো।

হেড়ু সিগন্যাল দিচ্ছে গ্যাখ। কী বলছে যেন।

সত্যই দেখা গেল, দেবেশ্বরবাবু পাইলটের পাশে বসে হাত নেড়ে ওদের কী দেখাচ্ছে।

আসফাকুল বলল, স্যার তো ওই ক্ষ্যাপা জলের দিকে আঙুল দেখিয়ে কিসের যেন সিগন্যাল দিচ্ছে।

অচিন্ত বলল, পিছিয়ে যেতে বলছে। ওই গ্যাখ হাত নাড়ছে।

সত্যিই তাই। ওরা পাঁচজনই দেখলো, হেড়ু তার সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে দু'হাত নেড়ে পিছিয়ে যাবার সিগন্যাল দিচ্ছে। ঘাড়ের চাদর কোমরে খসে পড়ল। কাচের ওপাশে আছেন বলে দেবেশ্বরবাবুর মুখের কথা কিছু শোনা যাচ্ছে না। তিনি কিন্তু ভয়ঙ্কর চেঁচিয়ে কিছু বলে যাচ্ছেন। কাচ না থাকলেও শোনা যেত না। জলের ডাক একদিকে। অন্যদিকে হেলিকপটারের আওয়াজ। তারপর তো লক্ষ্মীকান্তর গোঙানি আছেই।

হায়দার বলল, প্রথমবার তো হেড়ু হেলিকপটারে ছিল না।

অচিন্ত্যও তাই বলল, আমরা কয়লা ছোঁড়ার সময় তো দেখিনি।

হনুমানদা বলল, লাল লঞ্চের ছাদে নেমে তোদের হেড়ুকে তুলে এনেছে।

হনুমানদার কথাও শেষ হয়েছে—আর অমনি বঙ্গোপসাগরের বুকে একদম ফাংশন বসে গেল। একদম তাই। দূরে লাল লঞ্চটা ভেসে উঠল। আর জলের ওপর দিয়ে মাইকের আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল।

হ্যালো। হ্যালো। মাইক টেষ্টিং। হ্যালো। ওয়ান। টু। থ্রি। হ্যালো মাইক—

হনুমানদা বলল, আমাদের ধরতে মাইকও এনেছে। যাতে দূর থেকে ডাক শুনতে পাই সেজন্যে মাইক। বলেই হনুমানদা 'লক্ষীকান্তকে' ঘুম থেকে ফের ডেকে তুললো। জেগে উঠেই লক্ষীকান্ত গর-র-র গর-র-র করতে শুরু করে দিল।

মাগুরার মুখ ঘুরিয়ে হনুমানদা সবে সেই চওড়া গাঢ় নীল জলের পথটার দিকে স্টার্ট দিয়েছে—এমন সময় লাল লঞ্চ থেকে মাইকের গলা ভেসে এল।

সাবধান। তোমাদের সামনেই সিপসা, রূপসা, ভৈরবের জল মোহনায় এসে পড়ছে। ও পথে পা দিলেই মৃত্যু। সাবধান !!

হনুমানদা তবু থামলো না।

মাইক বলে যাচ্ছিল: তিন তিনটে বড় নদীর জল ওখানে একসঙ্গে আছড়ে পড়ে লড়াই করতে করতে এগোচ্ছে। ওখানটায় জল এখন সাক্ষাৎ যম। আর এগোলেই মৃত্যু। খবরদার !

তারপর মাইক একটু থেমেই আবার বলে উঠলো। নৃপেন! বাবা আমার। কেন শুধু শুধু মরতে যাচ্ছিস। তোর কিসের অভাব বাবা। আমি তোর বাবা বলছি। আমি জয়ন্ত দত্তচৌধুরি। এবার মাইক কেঁদে ফেলল। বাবা আমার—

আর হাত পঞ্চাশেক এগোলেই সেই জল। নৃপেনের মনটা একদম দমে গেল। এতদূর এসে ফিরে যাব? আমাদের আর ফার্স্ট হওয়া হবে না? চালাও হনুমানদা। যা আছে কপালে।

পবিত্র বললল, বাবাদের ডাকে একদম ভুলিসনা। একবার হাতে পে-পে-পেলেই আবার প্যাদাবে। এবার তো ডবল প্যাদানি।

মাইক এবার 'বাজান' 'বাজান' বলে কাঁদছিল। আর বলছিল, ওরে তুই মরিস না। বাড়িতে আসফাকুলকে তার আব্বা 'বা-জান' বলে ডাকে।

এবার দেখা গেল লাল লঞ্চটা একদম কাছে এসে গেছে। বেশ বড় সড় লঞ্চ। জল পুলিশের লঞ্চ। একদম তকতকে। ঝকঝকে। ডেকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পাঁচজনের সবাই অঝোরে কাঁদছে। ওদের মাঝে দাঁড়ানো আর দু'জনকে চেনা গেল। একজন—সোলার টুপি মাথায় এস এম আলি স্যার। অন্যজন এস এস মাগুরার ক্যাপটেন—মহবুব আলম। এদের দু'জনের চোখেই শুধু জল নেই। একজনের চোখে—হনুমানদা দেখলো—একদম আগুন ঠিকরে পড়ছে। অন্যজন সোলার টুপি হাতে নিয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠলো—এখন কিন্তু নিরক্ষীয় বায়ু উঠলে কেলেঙ্কারি। তোরা এখনো লঞ্চের মুখ ঘোরা বাবারা। লক্ষ্মী আমার। কেউ তোদের মারবে না। আমি কথা দিচ্ছি। আমি ঠেকাবো। ফিরে আয়—

জেগে উঠেই লক্ষীকান্ত তার তিরিশটা ঘোড়া ছেড়ে দিল। ঘোড়াগুলো এতক্ষণ ইঞ্জিনের ভেতর দাপাচ্ছিল। হনুমানদা চেঁচিয়ে বলল, তোরা বয়লারে গিয়ে ঠেসে কয়লা দে। তারপর আমি দেখছি—

ওরা পাঁচজন দুড়দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে বয়লার ঘরে নেমে গেল। হনুমানদা হালে মোচড় দিয়ে একলাফে মাগুরাকে সেই চওড়া, গাঢ়, নীল, উজ্জ্বল জলের পথে নিয়ে গিয়ে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে একবার শুধু ক্যাঁচ করে আওয়াজ হল। হনুমানদা হালের গোল স্টিয়ারিংটার ওপর মাথা ঠুকে গিয়ে সারেংঘরের মেঝেতে পড়ে গেল। বাবাগো!

নিচে বয়লারের ঢাকনা খোলার সময়ও ওরা পায়নি। পাঁচজন পাঁচদিকে ছিটকে গেছে। হায়দারের মাথা ঠুকে গেল পাটাতনে।

লাল লঞ্চ থেকে মহাবুবই প্রথম চেঁচিয়ে উঠলো। আল্লা! তখন মাগুরা সেই কুস্তীগীর জলের ভেতর পড়ে পুরো একটা পাক খেয়েই সিধে হয়ে গেছে। দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই জলের তোড়ে সে গাঢ় নীল জলপথ ধরে ছুটতে লাগল। তার পেছনে, পিঠে ক্রমাগত জলের চাবুক। তিন তিনটে নদীর লড়াই করা জল। একদম মোহানার মুখে।

সবাই কাঁদছে দেখে মহাবুব একা একা ক্যাপটেনের ঘরে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। ক্যাপটেন গম্ভীর হয়ে ম্যাপ দেখছিল। মাঝে মাঝে চোখ খুলে কম্পাসে তাকাচ্ছিল। মহাবুবকে দেখে বলল, একবার যদি হাই সি-তে গিয়ে পড়ে—কেউ বাঁচাতে পারবে না—

একটা রাস্তা আছে। মোহানার জলের তোড় এখান থেকে বারো তের মাইল দূরে গিয়ে নরম হয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে মাগুরায় উঠতে পারলে আমি ফিরিয়ে আনতে পারব ওদের।

ডাকলে কথা শুনবে না?

এখন ডাকলেও ওদের কানে কিছু যাবে না। তা'ছাড়া—

তাছাড়া কি? এখুনি বলুন।

ওদের কি আর জ্ঞান আছে এখন! যে চালাচ্ছিল—তাকে তো আমি ঝাঁকুনিতে ছিটকে পড়তে দেখলাম। আপনি হেলিকপ্টারকে সিগন্যাল দিন। সেকেণ্ড ডেকে এসে নামুক!

তারপর?

হেডস্যারকে নামিয়ে দিয়ে আমি ওঁর জায়গায় গিয়ে বসব। তারপর উড়ে উজিয়ে তের মাইল গিয়ে ওয়েট করব।

জলপুলিশের লঞ্চের ক্যাপটেন একবার মহবুব আলমের দিকে তাকালেন। গোঁফের জায়গাটা কামানো। লম্বা চাপ দাড়ি বাতাস পেয়ে দক্ষিণ দিকে তেরছা হয়ে উড়ছে। চোখ দু'টি ছুটে

যাওয়া মাগুরার দিকে তাকানো। ক্যাপ্টেন বলল, আমি রেডিও সিগন্যাল দিচ্ছি।

হেলিকপ্টার সেকেণ্ড ডেকে এসে নামলো। দেবেশ্বর বাবু আলু থালু অবস্থায় নেমে এলেন। মাথার কয়েক গাছি চুল আপনা আপনি ঝুলে পড়েছে কপালে। তার জায়গায় গিয়ে মহবুব আলাম বসতেই হেলিকপ্টারটা আকাশে উঠে গেল।

পাইলট বলল, ওদের লঞ্চের কাছে আর যাব না। কয়লা ছুঁড়বে।

চলুন না? এখন কেউ আর কয়লা ছুঁড়তে পারবে না।

সত্যিই তাই। মাগুরা ছুটছে। জলের চাবুক তার পিঠে। পড়ছেই, পড়ছেই। স্বচ্ছ আড়ালের ওপাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে মহবুব যা দেখল—তাতে বুঝলো, তারই লঞ্চে উড়ে এসে জুড়ে বসা সেই আনাড়ি সারেংয়ের এখনো জ্ঞান হয়নি। কিংবা সারেংঘরের পাটাতনেই পড়ে আছে। জলের তোড়ে লঞ্চের ঝাঁকুনি সামলাতে না জানলে ওই দশাই হবার কথা। কিন্তু ছেলেগুলো কোথায় গেল?

বয়লার ঘরের দরজায় পাঁচজনই ঝাঁকুনির চোটে ছিটকে গিয়েছিল। সবার আগে উঠলো নৃপেন। তারপর আসফাকুল। পবিত্রর চোখে মুখে জলের ছিঁটে দিতেই জেগে উঠলো। জেগেই বলল, কে-কে প্যাদালোরে আমাদের?

মোহানার পাগলা জল! হাসতে হাসতে বলেই আসফাকুল বলল, একবার ওপরে যাই চল। হনুমানদা চালাচ্ছে কিন্তু ভাল। আগের জন্মে নিশ্চয় সারেং ছিল।

ওপরে উঠে ওদের চক্ষুস্থির। বিনা সারেংয়ে লক্ষীকান্ত একা একা গজরাচ্ছে। কোন অদৃশ্য শক্তি খুলে মাগুরা একা একা ছুটে চলেছে। হালের ধারে কাছেও হনুমানদা নেই। কোথায় গেল লোকটা?

বিশেষ খুঁজতে হল না।। সারেংঘরের পাটাতনে হনুমানদা

যখন উঠে বসল—তখন মাগুরার জল-মিটারের কাঁটা একেবারে শেষের কোঠায় এসে তির তির করে কাঁপছিল।

উঠে দাঁড়িয়ে হালে বসে প্রথম কথাই বলল হনুমানদা, লাল লঞ্চটা কোনদিকে ছাখতো? ওরা পেছনে তাকিয়ে দেখলো, ওদের চওড়া, গাঢ়, উজ্জ্বল নীল জলপথটার ঠিক বাইরে ফ্যাকাশে জলের ওপর সেই অনেক পেছনে একটা লাল বিন্দুর মত লঞ্চটা দৃষ্টিপথে আঠা হয়ে লেগে আছে। ওরা যতই এগোয় লাল বিন্দুটা ওদের পেছন ছাড়ে না।

বেশ হল কিন্তু হনুমানদা। এই স্পীডে এগোলে কিন্তু আমাদের কেউ আর ধরতে পারবে না।

সেটি ভেবো না নৃপেন। ওই ছাখো। মাথার ওপর বড়মাছিটা দিব্যি ভন ভন করছে।

সত্যি তো। ওরা পাঁচজনই কয়লার ঝুড়িটা নিয়ে খোলা ডেকে বেরিয়ে এল। সেখানে দাঁড়িয়ে ওরা পাঁচজনই একসঙ্গে বাতাসে উড়ন্ত কালো চাপ দাড়ির মালিককে এক পলকে চিনতে পারলো। ওরা কয়লা তুলেছিল। মহবুবদার হাসি দেখে হাত নেমে এল। মহবুব আলম ডান হাত তুলে ওদের অভয় দিল।

নৃপেন পড়ে গেল মহা মুশকিলে। মহবুবদা যদি জানতো—আজ কেন তাঁরা সমুদ্রযাত্রী? তাহলে কি লঞ্চের মাথায় মাথায় হেলিকপ্টারে বসে এমন ভন ভন করে উড়তো? কিন্তু কি করে জানাবে এখন? জানালেও বিশ্বাস করবে কি মহবুবদা? কারণ, তারা নিজেরাই তো বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। এখন সে সিওর—এই পাগলা জলপথটাই স্যারের পেন্সিলে আঁকা ম্যাপের ওপরের সেই লাল দাগটা—যার শেষে কিনা কোশ্চেন ছাপার জাহাজ এস এস একজামিনেশন দাঁড়িয়ে আছে।

মাথার ওপরে উড়ন্ত হেলিকপ্টারে মহবুবদার সামনে ওদের পাঁচজনেরই মাথা হেট হয়ে যাচ্ছিল। আসফাকুলের মনে পড়ছিল

—স্পোর্টসের দিনকার স্কুলের মাঠ। কণার কথা বার বার উঁকি দিচ্ছিল নৃপেনের মনে। সে এভাবে বিফল হয়ে কী করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? আর দাঁড়ানো যায়! এখন তো সে শুধু লঞ্চ চোর! তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। কণা কি আর তার সঙ্গে কথা বলবে কোনদিন?

হনুমানদাও ক্লান্ত। হায়দারকে ডেকে বলল, কিছু খাবার দেতো। সেই একঠায় কাল থেকে হালে বসে আছি। বয়লারটাও দেখা দরকার।

নৃপেনের অবস্থা বুঝে, হনুমানদার অবস্থা বুঝে আসফাকুল বাকিদের নিয়ে বয়লার, খাবার ঘরের দিকে গেল।

হনুমানদা বলল, তোদের কুমুদস্যার লোকটা গোলমেলে আছে। ম্যাপের ওপর লাল দাগ ধরে জায়গা খুঁজতে হলে আমরা তো অনন্তকাল সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবো। কোথায় তোদের সেই জাহাজ?

কিছু বুঝতে পারছিনে হনুমানদা। হেডুর জায়গায় মহাবুব সারেং এসে বসেছে।

আসলে হয়ত ওরকম কোন জাহাজই নেই।

তা কি করে হয়? স্যার নগদ দু'শো টাকা নিলেন—

ছাখ গিয়ে তাই দিয়ে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে। হয়ত বাকি পড়েছিল।

মাগুরার ঘড়িতে বেলা দেড়টা প্রায়। সমুদ্রে হাওয়া আছে। রোদ্দুর আছে। কিন্তু তবু কেমন শুকনো হয়ে যাচ্ছে শরীরটা।

তির তির করে কাঁপা জল-মিটারের কাঁটাটার দিকে তাকিয়ে হনুমানদা বলল, আমরা কি কোনদিন ডাঙায় ফিরতে পারব। মনে তো হয় না। কয়লা ফুরোলে শুধুই ভেসে বেড়াতে হবে। এখানে এত জল—নোঙর ফেললেও থৈ পাবে না।

এক পাল হাঙর তখন পিঠের ওপরের পাখনা দিয়ে তির তির করে জল কেটে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। হনুমানদার সঙ্গে

নৃপেনও পাটাতনের ওপর বসে জলের কিনারে হাঙরদের মিলিয়ে যাওয়া দেখছিল।

ঠিক সেই সময় সারেংঘরের পেছনের খোলা ডেকে মহবুব আলম হেলিকপটার থেকে দড়ির মই বেয়ে টুক করে নেমে পড়ল।

হাঙরের ঝাঁক দেখতে দেখতে ওদের খেয়ালই হয়নি। প্রথমে হনুমানদা অবাক হল। মাগুরার গায়ে তো তেমন জোরে ঢেউ ভেঙে পড়ছে না? জল পথটা ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। তেমন স্পিডও নেই।

তড়াক করে উঠে বসে হনুমানদা তো অবাক। তার জায়গায় একটা দেড়েল বসে। গোঁফের জায়গাটুকু আবার কামানো। সারেং ঘরের পেছন থেকে হেলিকপটারটা চো চো আকাশে উঠে যাচ্ছে। সর্বনাশ। নেপেন—

নৃপেন ঘুরে বসতেই মহবুব আলম হেসে ফেলল। পাগলা জলের বাইরে লঞ্চকে আনতে পেরেছি। যাক! একটা ফাঁড়া কাটলো।

কলাইয়ের থালা বোঝাই ডিমভাজা নিয়ে আসফাকুল ওপরে উঠতে উঠতে সারেংয়ের সিটে মহবুবদাকে দেখে তো অবাক। তুমি কোত্থেকে?

হেলিকপটার থেকে! যাক! তোরা ভালো মাল্লা হতে পারবি লঞ্চের। দ্যাখতো স্টিম আছে কিনা বয়লারে?

আসফাকুল কিন্তু কিন্তু করছিল। হায়দার আলি ভয়ে ভয়ে বলল, মহবুব ভাই—আমাদের একটু রহেম কর। এরকম কথা সে মসজিদের বাইরে ফকিরদের মুখে শুনেছে। সেটাই লাগিয়ে দিল। সে কথা কানে না তুলে মহবুব সারেং সোজা হয়ে দাঁড়ানো হনুমানদাকে বলল, আপনি তো বেশ ভালোই চালান। কোন্ লাইনের সারেং আপনি?

আমি সারেং না। জোকার। সার্কাস উঠে গেল তাই—